রমেশচন্দ্র দত্ত

জন্ম—১৩ই আগষ্ট, ১৮৪৮ সন

মৃত্যু—৩০শে নভেম্বর, ১৯০৯ সন

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বীরনগর গ্রামে গ্রীষ্মঋতুর একদিন সায়ংকালে গঙ্গাসৈকতে দুইটি বালক ও একটি বালিকা ক্রীড়া করিতেছে। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া প্রান্তর ও প্রশস্ত গঙ্গানদী আচ্ছাদন করিতেছে। জলের উপর কয়েকখানি পোত ভাসিতেছে, দিনের পরিশ্রমের পর নাবিকেরা রন্ধনাদিতে ব্যস্ত রহিয়াছে, পোত হইতে দীপালোক নদীর চঞ্চল বক্ষে বড় সুন্দর নৃত্য করিতেছে। বীরনগরের নদীকূলস্থ আম্রকানন অন্ধকার হইয়া ক্রমে নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিতেছে। কেবল বৃক্ষের মধ্য হইতে স্থানে স্থানে এক একটি দীপশিখা দেখা যাইতেছে, আর সময়ে সময়ে পর্ণকুটীরাবলী হইতে রন্ধনাদি সংসারকার্য সম্বন্ধীয় কৃষক-পত্নীদিগের কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে, কৃষকগণ লাঙ্গল লইয়া ও গরুর পাল হাম্বারব করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করিতেছে। ঘাট হইতে স্ত্রীলোকেরা একে একে সকলেই কলস লইয়া চলিয়া গিয়াছে। নিস্তব্ধ অন্ধকারে বিশাল শান্ত-প্রবাহিনী ভাগীরথী সমুদ্রের দিকে বহিয়া যাইতেছে। অপর পার্শ্বে প্রশস্ত বালুকাতট ও অসীম কান্তার অন্ধকারে ঈষৎ দৃষ্ট হইতেছে। গ্রীষ্ম-পীড়িত ক্লান্ত জগৎ সুস্নিগ্ধ সায়ংকালে নিস্তব্ধ ও শান্ত।

তিনটি বালক-বালিকায় ক্রীড়া করিতেছে, বালিকার বয়ঃক্রম নয় বৎসর হইবে। ললাট, বদনমণ্ডল ও গণ্ডস্থল বড় উজ্জ্বল, তাহার উপর নিবিড় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ পড়িয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছে। হেমলতার নয়নের তারা দু'টি অতিশয় কৃষ্ণ, অতিশয় উজ্জ্বল, সুন্দরী চঞ্চলা বালিকা পরীকন্যার মত সেই নৈশ গঙ্গাতীরে খেলা করিতেছে।

কনিষ্ঠ বালকটির বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর হইবে, দেখিলেই যেন হেমলতার ভ্রাতা বলিয়া বোধ হয়। মুখমণ্ডল সেইরূপ উজ্জ্বল, প্রকৃতি সেইরূপ চঞ্চল। কেবল উজ্জ্বল নয়ন দুইটিতে

পুরুষোচিত তেজোরাশি লক্ষিত হইত ও উন্নত প্রশস্ত ললাটের শিরা এই বয়সেই কখন কখন ক্রোধে স্ফীত হইত। নরেন্দ্রকে দেখিলে তেজস্বী ক্রোধপরবশ বালক বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীশচন্দ্র ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক, কিন্তু মনুষ্যের গম্ভীর ভাব ও অবিচলিত স্থিরবুদ্ধির চিহ্ন বালকের মুখমণ্ডলে বিরাজ করিত। শ্রীশচন্দ্র বুদ্ধিমান, শান্ত, গম্ভীর-প্রকৃতির বালক।

দুইটি বালক বালুকার গৃহ নির্মাণ করিতেছিল, কাহার ভাল হয়, হেমলতা দেখিবে। নরেন্দ্র গৃহনির্মাণে অধিকতর চতুর কিন্তু চঞ্চল; হেম যখন নিকটে দাঁড়ায়, নরেন্দ্রের ঘর ভাল হয়, আবার হেম শ্রীশের ঘর দেখিতে গেলেই নরেন্দ্র রাগ করে, বালুকাগৃহ পড়িয়া যায়। মহাবিপদ, দুই-তিনবার উৎকৃষ্ট ঘর পড়িয়া গেল।

হেম এবার আর শ্রীশের নিকট যাবে না, সত্য যাবে না, যথার্থ যাবে না; নরেন্দ্র, আর একবার ঘর কর। নরেন্দ্র মহা-আহ্লাদে চক্ষুর জল মুছিয়া ঘর আরম্ভ করিল।

ঘর প্রায় সমাধা হইল। হেম ভাবিল, নরেন্দ্রের ত জয় হইবে, কিন্তু শ্রীশ একাকী আছে, একবার উহার নিকট না যাইলে কি মনে করিবে? কেশগুচ্ছগুলি নাচাইতে নাচাইতে উজ্জ্বল জলহিল্লোলের ন্যায় একবার শ্রীশের নিকটে গেল। শ্রীশ ক্ষিপ্রহস্ত নহে, বালুকা-গৃহনির্মাণে চতুর নহে, কিন্তু ধৈর্য ও বুদ্ধিবলে একপ্রকার গৃহ করিয়াছে, বড় ভাল হয় নাই।

নরেন্দ্র একবার গৃহ করে, একবার হেমের দিকে চাহে। রাগ হইল, হাত কাঁপিয়া গেল, উত্তম গৃহ পড়িয়া যাইল। নরেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বালুকা লইয়া হেম ও শ্রীশের গায়ে ছড়াইয়া দিল। শ্রীশের জিত, ঘর হইল না।

নরেন্দ্রনাথ, সাবধান! আজ বালুকাগৃহ নির্মাণ করিতে পারিলে না, দেখ, যেন সংসার-গৃহ ঐরূপে ছারখার হয় না। দেখ, যেন জীবন-খেলায় শ্রীশচন্দ্র তোমাকে হারাইয়া বিষয় ও হেমলতাকে জিতিয়া লয় না।

নরেন্দ্রের ক্রোধধ্বনি শুনিয়া ঘাট হইতে একটি সপ্তদশবর্ষীয়া বিধবা স্ত্রীলোক উঠিয়া আসিলেন। তিনি শ্রীশের জ্যেষ্ঠা ভগিনী; নাম শৈবলিনী।

শৈবলিনী আসিয়া আপন ভ্রাতাকে তিরস্কার করিল। শ্রীশ ধীরে ধীরে বলিল, "না দিদি, আমি কিছুই করি নাই, নরেন্দ্র ঘর করিতে পারে না, সেইজন্য কাঁদিতেছে, হেমকে জিজ্ঞাসা কর।" "তা না পারুক, আমি নরেন্দ্রের ঘর করিয়া দিব।" এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া শৈবলিনী চলিয়া গেলেন। শ্রীশ দিদির সঙ্গে চলিয়া গেল।

হেম ও নরেন্দ্রের কলহ শীঘ্র শেষ হইল। হেম নরেন্দ্রের ক্রন্দন দেখিয়া সজলনয়নে বলিল, "ভাই, তুমি কাঁদ কেন? আমি একটিবার ঘর দেখিতে গিয়াছিলাম, তোমারই ঘর ভাল হইয়াছিল, তুমি ভাঙিলে কেন? তোমার কাছে অনেকক্ষণ ছিলাম, শ্রীশের কাছে একবার গিয়াছিলাম বৈ ত নয়? তুমি ভাই, রাগ করিও না; তুমি ভাই, কাঁদ কেন?" নরেন্দ্র কি আর রাগ করিতে পারে? নরেন্দ্র কি কখন হেমের উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারে?

তাহার পর বালক-বালিকার কি কথা? আকাশে কেমন তারা ফুটিয়াছে। ওগুলা কি ফুল, না মানিক? নরেন্দ্র যদি একটি কুড়াইয়া পায়, তাহা হইলে কি করে? তাহা হইলে গাঁথাইয়া হেমের গলায় পরায়। ঐ দেখ, চাঁদ উঠিবার আগে কেমন রাঙা হইয়াছে। ও আলো কোথা হইতে আসিতেছে? বোধ হয়, নদী পার হইয়া খানিক যাইলে ঐ আলো ধরা যায়। না, তাহা হইলে ওপারের লোক ধরিত। বোধ হয়, নৌকা করিয়া অনেক দূর যাইতে যাইতে চাঁদ যে দেশে উঠে, তথায় যাওয়া যায়; সে দেশে কি রকম লোক, দেখিতে ইচ্ছা করে। নরেন্দ্র বড় হইলে একবার যাবে, হেম, তুমি সঙ্গে যেও।

বালক-বালিকা কথা কহিতে থাকুক, আমরা এই অবসরে তাহাদের পরিচয় দিব। এই সংসারে বয়োবৃদ্ধ বালক-বালিকারা গঙ্গার বালুকার ন্যায় ছার বিষয় লইয়া কিরূপ কলহ করে, চন্দ্রালোকের

ন্যায় বৃথা আশার অনুগমন করিয়া কোথায় যাইয়া পড়ে, তাহারই পরিচয় দিব। পরিচয়ে আবশ্যক কি? পাঠক, চারিদিকে চাহিয়া দেখ, জগতের বৃহৎ নাট্যশালায় কেমন লোকসমারোহ, সকলেই কেমন নিজ নিজ উদ্দেশ্যে ধাবমান হইতেছে! কে বলিবে কি জন্য?

॥ দুই ॥

নরেন্দ্রনাথের পিতা বীরেন্দ্রনাথ দত্ত ধনাঢ্য ও প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। তিনি নিজ গ্রামে প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া আপন নামানুসারে গ্রামের নাম বীরনগর রাখিয়াছিলেন। তাঁহার যথার্থ সহৃদয়তার জন্য সকলে তাঁহাকে মান্য করিত, তাঁহার প্রবল প্রতাপের জন্য সকলে তাঁহাকে ভয় করিত, পাঠান-জায়গীরদারগণ ও স্বয়ং সুবাদার তাঁহাকে সম্মান করিতেন।

বাল্যকালে বীরেন্দ্র নবকুমার মিত্র নামক একটি দরিদ্র-পুত্রের সহিত একত্রে পাঠশালায় পাঠ করিতেন। নবকুমার অতিশয় সুশীল ও নম্র ও সর্বদাই তেজস্বী, বীরেন্দ্রের বশংবদ হইয়া থাকিত, সুতরাং তাহার প্রতি বীরেন্দ্রের স্নেহ জন্মিয়াছিল। যৌবনকালে যখন বীরেন্দ্র জমিদারী স্থাপন করিলেন, নবকুমারকে ডাকাইয়া আপনার অমাত্য ও দেওয়ান-পদে নিযুক্ত করিলেন। নবকুমার অতিশয় বুদ্ধিমান ও সুচতুর, সুশৃঙ্খলরূপে কার্য-নির্বাহ করিতে লাগিলেন। নবকুমার স্বার্থপর হইলেও নিতান্ত মন্দ লোক ছিলেন না, বীরেন্দ্রের নিকট ভিক্ষা করিয়া দুইখানি গ্রাম আপনার নামে করিলেন, কিন্তু ভয়ে হউক, কৃতজ্ঞতা-বশতঃ হউক, বীরেন্দ্রের জমিদারীর কোনও হানি করেন নাই; বীরেন্দ্রের মৃত্যুর সময়ে নরেন্দ্র অতি শিশু, জমিদারী ও পুত্রের ভার প্রিয় সুহৃদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া বীরেন্দ্র মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

ভালবাসা যতদূর নামে ততদূর উঠে না, অপত্যস্নেহের ন্যায় পিতৃস্নেহ বা মাতৃস্নেহ বলবান্ হয় না, দয়া অপেক্ষা কৃতজ্ঞতা দুর্বল ও ক্ষণভঙ্গুর। নবকুমারের কৃতজ্ঞতা শীঘ্র ভাঙিয়া গেল।

নবকুমার নিতান্ত মন্দ লোক ছিলেন না, কিন্তু নবকুমার দরিদ্র, ঘটনাস্রোতে সমস্ত জমিদারী প্রাপ্তির আশা তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইল। সে লোভ দরিদ্রের পক্ষে দুর্দমনীয়। বীরেন্দ্রের পুত্র অতি শিশু, বীরেন্দ্রের স্ত্রী পূর্বেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন, শিশুর বিষয় রক্ষা করে, এরূপ জ্ঞাতি-কুটুম্ব কেহ ছিল না, দুই একজন যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও নবকুমারের সহিত যোগ দিলেন। সংসারে যাঁহারা বীরেন্দ্রের অভিভাবক ছিলেন, তাঁহারা কিছুই জানিলেন না অথচ জানিয়া কি করিবেন ?

তথাপি নবকুমার সমস্ত জমিদারী একাকী লইবেন, প্রথমে এরূপ উদ্দেশ্য ছিল না, বীরেন্দ্রের জীবদ্দশাতেই দুই পাঁচখানি গ্রাম আপন নামে করিয়াছিলেন, এখন আরও দুই-পাঁচখানি গ্রাম আপন নামে করিতে লাগিলেন। ক্রমে লোভ বাড়িতে লাগিল। ভাবিলেন, আমার একমাত্র কন্যা হেমের সহিত নরেন্দ্রের বিবাহ দিব, অবশেষে বীরেন্দ্রর জমিদারী তাঁহার পুত্রেরই হইবে, এখন নাবালকের নামে জমিদারী থাকিলে গোলমাল হইতে পারে, সম্প্রতি আপন নামে থাকাতে বোধ হয়, কোন আপত্তি হইতে পারে না। এই প্রকার চিন্তা করিয়া তদনুসারে কার্য করিতে লাগিলেন।

তৎকালে সুবাদারের সভাতে প্রধান প্রধান জমিদার ও জায়গীদারদিগের এক একজন উকীল থাকিত। তাহারা নিজ নিজ মনিবের পক্ষ হইতে মধ্যে মধ্যে নজর দিয়া সুবাদারের মন তুষ্ট রাখিত ও মনিবের পক্ষ হইতে আবেদন আদি সমস্ত কার্য নির্বাহ করিত। সদরে এইরূপে একটি একটি উকীল না থাকিলে জমিদারীর বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল।

বীরনগর জমিদারীর উকীল এক্ষণে নবকুমারের বেতন-ভোগী। তিনি বঙ্গদেশের কানঙ্গু মহাশয়ের নিকট আবেদন করিলেন যে, বীরেন্দ্রের মৃত্যু হইতে জমিদারীর খাজনা নিয়মিত-রূপে আসিতেছে না, তবে নবকুমার নামে একজন কার্যদক্ষ লোক সেই জমিদারীর ভার লইয়া আপন ঘর হইতে যথাসময়ে

খাজনা দিতেছে। নবকুমার বীরেন্দ্রের বিশেষ আত্মীয় ও বীরেন্দ্রের পরিবারকে প্রতিপালন করিতেছে। এই আবেদনসহ পঞ্চ সহস্র মুদ্রা কানঙ্গু মহাশয়ের নিকট উপঢৌকন গেল। আবেদনের বিরুদ্ধে কেহ দণ্ডায়মান ছিল না, তৎক্ষণাৎ বীরেন্দ্রের নাম খারিজ হইয়া নবকুমারের নাম লিখিত হইল। অদ্য নবকুমার মিত্র বীরনগরের জমিদার।

জমিদারের হৃদয়ে নূতন নূতন ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল· যে নরেন্দ্রের পিতাকে পূর্বে পূজা করিতেন, যে নরেন্দ্রকে এতদিন অতিযত্নে পালন করিয়াছেন, অদ্য সেই নরেন্দ্র তাঁহার চক্ষুর শূল হইল। নবকুমারের সাক্ষাতে না হউক, অসাক্ষাতে সকলেই বলিত, 'নরেন্দ্রের বাপের জমিদারী', 'নবকুমারের জমিদারী' কেহ বলিত না; গ্রামের প্রজারাও নরেন্দ্রকে দেখিয়া জমিদারপুত্র বলিত। প্রকৃত জমিদার নবকুমার কি এ সমস্ত সহ্য করিতে পারেন? তিনি চিন্তা করিলেন, আমি কি অপবাদ বহন করিবার জন্যই এই জমিদারী করিলাম? পুনরায় নরেন্দ্রের সহিত হেমের বিবাহ হইলে কে না বলিবে, পিতার জমিদারী পুত্র পাইল, আমার নাম কোথায় থাকিবে? এতটা করিয়া কি পরিণামে এই ঘটিবে? আমি কি জমিদার হইয়াও বালকের দেওয়ান বলিয়া পরিগণিত হইব? কার্যেও কি তাহাই করিব, সযত্নে জমিদারী রক্ষা করিয়া পরে নরেন্দ্রকে ফিরাইয়া দিব? বিচক্ষণ প্রগাঢ়মতি নবকুমার এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, আপন নাম চিরস্মরণীয় করা আবশ্যক। তিনি পোষ্যপুত্র লইবেন অথবা কোন দরিদ্রের সহিত আপন কন্যা হেমলতার বিবাহ দিবেন।

পণ্ডিতবর নবকুমার এইরূপ সুন্দর সিদ্ধান্ত করিয়া কার্যসাধনে যত্নবান্ হইলেন। নিকটস্থ একটি গ্রামে গোকুলচন্দ্র দাস নামক একজন ভদ্রলোক একটি পুত্র ও একটি বিধবা কন্যা ও অল্প সম্পত্তি রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। পুত্রটির নাম শ্রীশচন্দ্র

দাস, কন্যার নাম শৈবলিনী। নবকুমার শ্রীশচন্দ্রকে বীরনগরে আনাইয়া লালনপালন করিতে লাগিলেন। শৈবলিনী শ্বশুরালয়ে থাকিত, কখন কখন ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য বীরনগরে আসিয়া দুই-একদিন বাস করিত। ভ্রাতা ভিন্ন বিধবার আর কেহই এ জগতে ছিল না।

বুদ্ধিমান্ নবকুমার দয়াশূন্য ছিলেন না, বীরেন্দ্র জ্ঞাতি-কুটুম্বকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দেন নাই; পরিচারিকারূপে তাঁহারা সকলেই আহারাদি ও কার্য করিত ও দিবানিশি প্রকাশ্যে নবকুমারের গৃহিণীর সাধুবাদ ও খোসামোদ করিত, গোপনে বিধাতাকে নিন্দা করিত। নবকুমার নরেন্দ্রকে এখনও লালনপালন করিতেন, আপন অমাত্যবর্গের নিকট সর্বদাই ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিতেন, "কি করি! বীরেন্দ্র জমিদারী বুঝিতেন না, সমস্ত বিষয়টি খোয়াইয়াছিলেন। পরের হাতে গেলে বীরেন্দ্রের পরিবার ও পুত্রের কষ্ট হয়, সেইজন্য আমিই ক্রয় করিলাম, নচেৎ জমিদারীতে বিশেষ লাভ নাই। এখন অনাথ নরেন্দ্রকে আমি লালনপালন করিতেছি, বীরেন্দ্রের অনেকগুলি পরিবার, আমি খাইতে পরিতে দিতেছি। কি করি, মানুষে কষ্ট পায়, এ তো আর চক্ষে দেখা যায় না। আর ভাবিয়া দেখ, ভগবান টাকা দিয়াছেন কি জন্য? পাঁচজনকে দিয়েই সুখ, রাখিতে সুখ নাই, পরকে দিব, তাহাতে যদি আমার কিছু না-ও থাকে, সে-ও ভাল।"

অমাত্যেরা বলিত, "অবশ্য, অবশ্য, আপনি মহাশয় লোক, আপনার দয়ার শরীর, সেজন্যই এমন আচরণ করিতেছেন, অন্যে কি এমন করে? এই তো এত জমিদার আছে, আপনি যতটা বীরেন্দ্রের পরিবারের জন্য করেন, এমন আর কে কাহার জন্য করে? আহা, আপনি না থাকিলে নরেন্দ্রকেই বা কে খাইতে দিত, অন্য লোকেরই বা কে ভরণপোষণ করিত? তাহারা যে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায়, সে কেবল আপনার অনুগ্রহে। আপনার মত পুণ্যবান লোক কি আর আছে?"

হর্ষ-গদগদ-স্বরে ঈষৎ হাস্য-বিস্ফারিত লোচনে নবকুমার উত্তর করিতেন, "না বাপু, আমি পুণ্য জানি না, চিরকালই আমার এই স্বভাব। আজ বীরেন্দ্রের পরিবার বলিয়া কিছু নূতন নহে, ইহাতে দোষ হয়, আমি দোষী, পুণ্য হয়, তাহাই" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, নবকুমার নিতান্ত মন্দ লোক ছিলেন না। চাহিয়া দেখ, সকলেই নবকুমারকে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ লোক বলিয়া সমাদর করিতেছে। শুন, সকলেই তাঁহাকে দয়াশীল, ব্রাহ্মণভক্ত লোক বলিয়া খ্যাতি করিতেছে। অদ্যাপি নবকুমারের ন্যায় লোক লইয়া আমাদের সমাজ গর্বিত রহিয়াছে, তাঁহাদের সর্বস্থানে সমাদর, সর্বস্থানে প্রশংসা, সর্বস্থানে প্রভুত্ব। মানী জ্ঞানী বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন নবকুমার মরিলে সমাজ শিরোমণি হারাইবে, সমাজে হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে। যিনি সর্বস্থানে আদৃত, সকলের মান্য, তোমার আমার কি অধিকার আছে তাঁহার নিন্দা করি?

॥ তিন ॥

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, শৈবলিনী সন্ধ্যার সময় ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ধর্মপরায়ণা শান্তচিত্তা বিধবা সন্ধ্যায় পূজা সমাপ্ত করিয়া বালক-বালিকাগুলিকে লইয়া গল্প করিতে বসিলেন। শৈবলিনী মাসে কি দুই মাসে বীরনগরে আসিতেন। শৈবলিনী বড় গল্প করিতে পারিতেন। শৈবলিনীর সন্তানাদি নাই, সকল শিশুকেই আপনার বলিয়া মনে করিতেন। এই সমস্ত কারণে শৈবলিনী বালক-বালিকা-দিগের বড় প্রিয়পাত্রী। শৈব আসিয়াছেন, গল্প করিতে বসিয়াছেন, শুনিয়া এই প্রকাণ্ড অট্টালিকার সমস্ত বালক-বালিকা একত্র হইল, কেহই শৈবলিনীর অনাদরের পাত্র ছিল না। কাহাকেও ক্রোড়ে, কাহাকেও পার্শ্বে, কাহাকেও সম্মুখে বসাইয়া শৈবলিনী মহাভারতের অমৃতমাখা গল্প করিতে লাগিলেন। আমরা এই অবসরে শৈবলিনীর বিষয়ে দুই একটি কথা বলিব।

শৈবলিনীর পিতা সামান্য সঙ্গতিপন্ন ও অতিশয় ভদ্রলোক ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র ও শৈবলিনী পিতার গুণগ্রাম ও মাতার ধীরস্বভাব ও নম্রতা পাইয়াছিলেন, অতি অল্প বয়সে শৈবলিনী বিধবা হইয়াছিলেন, স্বামীর কথা মনে ছিল না, সংসারে সুখ-দুঃখ প্রায় জানিতেন না, এ জন্মে চির-কুমারী বা চির-বিধবা হইয়া কেবল মাতার সেবা ও ছোট ভাইটির যত্ন ভিন্ন আর কোন ধর্ম জানিতেন না।

শৈবলিনীর পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের অবস্থা ক্রমশ মন্দ হইতে লাগিল, এমন কি, অন্নের কষ্ট কাহাকে বলে, অভাগিনী শৈবলিনী ও তাঁহার মাতা জানিতে পারিলেন; কিন্তু সেই শান্ত নম্র বিধবা একবারও ধৈর্যহীন হন নাই, অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান ও পূজাদি সমাপন করিয়া কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা বৃদ্ধা মাতা ও শিশুর জন্য রন্ধনাদি করিতেন। প্রত্যূষে প্রফুল্ল পুষ্পের ন্যায় শৈবলিনী নিজ কার্য আরম্ভ করিতেন; শান্ত-নিস্তব্ধ সন্ধ্যাকালে শান্তচিত্তা বিধবা কার্য সমাপন করিয়া মাতার সেবায় ও শিশুভ্রাতার লালনপালনে রত হইতেন। সেই কৃষ্ণকেশমণ্ডিত, শ্যামবর্ণ, বাকশূন্য মুখখানি ও আয়ত শান্তরশ্মি নয়ন দুইটি দেখিলে, যথাথ হৃদয় স্নেহে আপ্লুত হয়। যথার্থই বোধ হয়, যেন সায়ংকালের শান্তি ও নিস্তব্ধতায় শৈবালে আবৃত মুদিতপ্রায় শৈবলিনী মুখখানি নত করিয়া রহিয়াছে।

এ জগতে শৈবলিনী কিছুরই আকাঙ্ক্ষিনী নহে। বিধবা শৈবলিনী সহচর চাহে না, যে আম্রবৃক্ষ ও বংশবৃক্ষ শৈবলিনীর নম্র কুটীর চারিদিকে সস্নেহে মণ্ডিত করিয়া মধ্যাহ্নে ছায়া বর্ষণ ও সায়ংকালে মৃদুস্বরে গান করিত, তাহারাই শৈবলিনীর সহচর। তাহারাও যেমন প্রকৃতির সন্তান, শৈবলিনীও সেইরূপ প্রকৃতির সন্তান; জগদীশ্বর তাহাদের ভরণপোষণ করিতেন, অনাথিনী শৈবলিনীকেও ভরণপোষণ করিতেন। শৈবলিনী শৈশবে বিধবা, কিন্তু প্রেমের আকাঙ্ক্ষিনী নহে, কেন না, সমগ্র জগৎ শৈবের প্রেমের

জিনিস। বৃক্ষে বসিয়া যে কপোত-কপোতী গান করিত, তাহারাও শৈবের প্রেমের পাত্র, তাহাদের সঙ্গে শৈব একত্র গান গাইত, তাহাদের প্রত্যহ তণ্ডুল দিয়া পালন করিত। শৈব যখন বৃদ্ধা মাতাকে সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিত, তখনই শৈবলিনীর হৃদয় প্রেমরসে আপ্লুত হইত, মাতাকে সুখী দেখিলে শৈবের নয়ন আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইত। যখন শিশু শ্রীশচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিত, যখন শিশু আহ্লাদিত হইয়া 'দিদি' বলিয়া শৈবকে চুম্বন করিত, তখন যথার্থই শৈবের হৃদয় নাচিয়া উঠিত, অশ্রুতে বসন ভিজিয়া যাইত। আর যখন সায়ংকালে শান্ত নিস্তব্ধ নদীর প্রশান্ত বক্ষে চন্দ্রতারাবিভূষিত স্বর্গের প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভগবানের কথা মনে পড়িত, যিনি চন্দ্র, তারা ও নদী সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি পক্ষীকে শাবক দিয়াছেন ও শৈবকে শ্রীশ দিয়াছেন, সেই ভগবানের কথা মনে পড়িত। তখনই শৈবলিনীর হৃদয় অনন্ত প্রেমে সিক্ত হইত। শৈবলিনীর স্বামী বা পুত্র নাই; শৈবলিনীর প্রেমের একমাত্র ভাগী কেহ ছিল না, সুতরাং বর্ষাকালের নদীস্রোতের ন্যায় শৈবের স্নেহবারি চারিদিকে বহিয়া যাইত। গ্রামের সমস্ত বালক-বালিকাকে শৈব বড় ভালবাসিত; শৈব অনাথা, দরিদ্রদিগের সমদুঃখিনী, পশুপক্ষীও শৈবের প্রেমের ভাগী; জগতে শৈবলিনীর ন্যায় প্রেমিক আর কে আছে? জগৎ যেরূপ বিস্তারিত, সমুদ্র যেরূপ গভীর, আকাশ যেরূপ অনন্ত, শৈবলিনীর প্রেম সেইরূপ বিস্তারিত, গভীর, অনন্ত।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে শৈবলিনীর মাতার কাল হইল, ধীর-স্বভাব, রূপবান, ভদ্রবংশজাত শ্রীশচন্দ্রকে নবকুমার আপন কন্যার সহিত বিবাহ দিবার ইচ্ছায় বীরনগরে লইয়া গেলেন। যাহাদের জন্য শৈবলিনী শ্বশুরগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারা না থাকায় শৈবলিনী পুনরায় শ্বশুরালয়ে গেলেন ও তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

॥ চার ॥

পূর্বোল্লিখিত ঘটনাবলীর পর চারি বৎসরকাল অতিবাহিত হইল। চারি বৎসরে কিরূপ পরিবর্তন হয়, পাঠক মহাশয় তাহা অনুভব করিতে পারেন।

শ্রীশচন্দ্র এক্ষণে সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমের যুবক, ধীর, শান্ত, বিচক্ষণ, ধর্মপরায়ণ। তাহার প্রশস্ত উদার মুখমণ্ডল ও উন্নত অবয়ব দেখিলেই তাহার গম্ভীর প্রকৃতি ও স্থিরবুদ্ধি জানিতে পারা যায়।

নরেন্দ্র পঞ্চদশ বর্ষের উগ্র যুবা, শ্রীশ অপেক্ষাও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ উন্নতকায় ও তেজস্বী, কিন্তু অতিশয় উগ্র, ক্রোধপরবশ ও অসহিষ্ণু। নবকুমারের ঘৃণা সে সহ্য করিতে পারিত না, শ্রীশচন্দ্রের যথার্থ গুণের কথাও সে সহ্য করিতে পারিত না, সর্বদা তাহার মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করিত। এখনও পর্যন্ত যে নরেন্দ্র এ সমস্ত সহ্য করিয়াছিল, সে কেবল হেমলতার জন্য। মরুভূমিতে একমাত্র প্রস্রবর্ণের ন্যায় হেমলতার অমৃতমাখা মুখখানি নরেন্দ্রের উত্তপ্ত হৃদয় শান্ত ও শীতল করিত, হেমলতার জন্য নরেন্দ্র নবকুমারের তিরস্কারও সহ্য করিত, আপন বিজাতীয় ক্রোধ সংবরণ করিত।

হেমলতা ত্রয়োদশবর্ষের বালিকা। আকাশে প্রথম উষাচিহ্নের ন্যায় প্রথম যৌবনচিহ্ন হেমলতার শরীরে প্রকাশ পাইতেছে। নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি লম্বমান হইয়া বক্ষস্থল ও গণ্ডস্থল আবরণ করিতেছে, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ যৌবনারম্ভে অধিকতর উজ্জ্বল আভায় প্রকাশ পাইতেছে, সুন্দর আয়ত নয়ন দুইটি বাল্যকাল-সুলভ চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ধীর ও শান্ত ভাব ধারণ করিতেছে; সমস্ত অবয়বও ক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে।

সেই সুগঠিত, কুসুম-বিনিন্দিত শরীরে কি নব নব ভাব প্রকাশ

করিয়াছে, তাহা বর্ণনায় আমরা অক্ষম ; তবে হেমলতার আচরণে যাহা লক্ষিত হয়, তাহাই বলিতে পারি। হেম এখনও নরেন্দ্রের সহিত কথাবার্তা কহিতে বড় ভালবাসে, কিন্তু বালিকা অধোবদনে ধীরে ধীরে কথা কহে, ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের মুখের দিকে নয়ন উঠাইয়া আবার মস্তক অবনত করে। আহা, সে আয়ত প্রশান্ত নয়ন দুইটি নরেন্দ্রের মুখের উপর চাহিতে বড় ভালবাসে। সেই বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় নরেন্দ্রের কথা ভাবিতে বড় ভালবাসে। যখন সায়ংকালে নরেন্দ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া গঙ্গার প্রশান্ত বক্ষে ইতস্তত বিচরণ করে, বালিকা গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া স্থির নয়নে তাহাই দেখে, যখন নৌকা অনেক দূর ভাসিয়া যায়, সন্ধ্যার অপরিস্ফুট আলোক যতদূর দেখা যায়, বালিকা সেই গঙ্গার অনন্ত স্রোত নিরীক্ষণ করে। সন্ধ্যার পর বাটী আসিয়া যখন নরেন্দ্র 'হেম' বলিয়া কথা কহিতে আইসে, তখন সেই আনন্দদায়িনী কথায় হেমের হৃদয় ঈষৎ নৃত্য করিয়া উঠে। যখন দুই-একদিনের জন্যও নরেন্দ্র ভিন্নগ্রামে গমন করে, তখন, প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে হেম অন্যমনা হইয়া থাকে।

তথাপি হেমের মনের কথা কেউ জানে না। কপোতী যেরূপ আপন শাবকটিকে অতি যত্নে কুলায় লুকাইয়া রাখে, বালিকা এই নূতন ভাবনাটিকে অতি সঙ্গোপনে হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিত। বালিকা নিজেও সে ভাবটি ঠিক বুঝিতে পারিত না ; না বুঝিয়াও সে প্রিয় ভাবটি সযত্নে জগতের নিকট হইতে সঙ্গোপন করিত।

বৃদ্ধ নবকুমার হেমকে এখনও বালিকা মনে করিতেন, সেই বালিকার উদার সরল মুখখানি দেখিলে কেনই বা মনে না করিবেন? বিবাহ দিলে একমাত্র কন্যা পরের হইবে, এই ভয়ে যতদিন পারিলেন, বিবাহ না দিয়া রাখিলেন। শ্রীশচন্দ্রও হেমের হৃদয়ের পরিচয় পাইল না, কিরূপেই বা পাইবে? হেম তাহার সহিত সর্বদাই অকপটে সরল-হৃদয়ে নিঃসংকোচে কথা

কহিত। শ্রীশচন্দ্রের নিকট প্রত্যহ কিছু কিছু পড়িতে শিখিত, পাঠ বলিয়া যাইত, পড়া হইলে পড়া দিত, যত্নের সহিত শ্রীশচন্দ্রের উপদেশবাক্য গ্রহণ করিত। নরেন্দ্র পড়াইতে আসিলে বালিকা মনঃস্থির করিতে পারিত না, নরেন্দ্র পড়া লইতে আসিলে বালিকা ভাল করিয়া বলিতে পারিত না, সমস্ত ভুলিয়া যাইত। সংসার-কার্যের তাবৎ ঘটনাই হেম শ্রীশচন্দ্রের নিকট বলিত, শ্রীশের উপদেশ ভিন্ন কোন কার্য করিত না। নরেন্দ্র উপদেশদাতা নহেন, নরেন্দ্র আসিলে অন্য কথা হইত অথবা অনেক সময় কথা হইত না; সুতরাং শ্রীশ মনে করিত যে, বালিকার হৃদয়ে যেটুকু প্রণয় বা স্নেহ আছে, তাহা শ্রীশকেই অবলম্বন করিয়াছে।

॥ পাঁচ ॥

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। একদিন সায়ংকালে শ্রীশ ও নরেন্দ্র একখানি নৌকায় আরোহণ করিয়া গঙ্গায় বিচরণ করিতেছিল। নরেন্দ্র আপন বলপ্রকাশ অভিলাষে দাঁড়ীকে উঠাইয়া দিয়া দুই হস্তে দুইটি দাঁড় ধারণ করিয়া নৌকা চালাইতেছে, শ্রীশ স্থিরভাবে বসিয়া প্রকৃতির সায়ংকালীন শোভা দর্শন করিতেছিল। শ্রীশ ও নরেন্দ্রের মধ্যে কখনই যথার্থ প্রণয় ছিল না, অদ্য অল্প কথা লইয়া তর্ক হইতে লাগিল। নরেন্দ্রের হস্ত হইতে সহসা একটি দাঁড় স্খলিত হওয়াতে নরেন্দ্র পড়িয়া গেল, শ্রীশ উচ্চহাস্য হাসিয়া বলিল, "যাহার কাজ, তাহাকে দাও, বীরত্বে আবশ্যক নাই।"

সেই সময়ে তীরস্থ অট্টালিকা হইতে হেমলতা দেখিতেছিল, হেমলতার সম্মুখে অপদস্থ হইয়া নরেন্দ্র মর্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছিল, তাহার উপর শ্রীশের রহস্যকথা সহ্য হইল না, অতিশয় কঠোর উক্তিতে প্রত্যুত্তর করিল। ক্রমে বিবাদ বাড়িতে লাগিল, নরেন্দ্র অতি শীঘ্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং অতিশয় অন্যায় কটুভাষায় শ্রীশকে তিরস্কার করিল। শ্রীশ এবার ক্রোধ সংবরণ করিতে

পারিল না, বলিল, "তোমার মত অভদ্র লোকের সহিত কলহ করিলেও অপমান আছে।"

এই অপমানসূচক কথায় নরেন্দ্রের ললাটের শিরা স্ফীত হইল, নয়ন প্রজ্বলিত হইল, সে শ্রীশকে প্রহার করিতে উঠিল; শ্রীশও উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্রুদ্ধ জ্ঞানশূন্য নরেন্দ্র সহসা শ্রীশকে ঠেলিয়া জলে ফেলিয়া দিল। "বাবু জলে পড়িল, জলে পড়িল" বলিয়া মাল্লারা চীৎকার করিয়া উঠিল, একজন ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িল এবং শ্রীশকে প্রায়-অজ্ঞান অবস্থায় নৌকায় উঠাইল।

সন্ধ্যার সময় নবকুমার নরেন্দ্রকে ডাকাইয়া যথেষ্ট ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "তুমি নাকি শ্রীশকে আজ গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়াছিলে? মাল্লারা না থাকিলে সে আজ ডুবিয়া মরিত।"

নির্বোধ জ্ঞানশূন্য নরেন্দ্র উত্তর করিল, "সে আমার সহিত কলহ করিতে আসে কেন?"

নবকুমার। শ্রীশের সহিত কলহ করিতে তোমার লজ্জা হয় না? জান না, তুমি কে আর শ্রীশ কে? তুমি কি শ্রীশের সমান?

নরেন্দ্র ক্রোধকম্পিত-স্বরে বলিল, "আমি শ্রীশের সমান নহি; আমি জমিদার বীরেন্দ্র সিংহের পুত্র, শ্রীশ পথের কাঙ্গালী, পরের অন্নে পালিত, তাহার সমান আমি কিরূপে?"

নবকুমার এরূপ উত্তর কখন শুনেন নাই; বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কাহার সহিত কথা কহিতেছ জান?"

নরেন্দ্র। জানি, যে দরিদ্র সন্তান, আমার পিতা কর্তৃক পালিত হইয়া কালসর্পের ন্যায় তাঁহাকে দংশন করিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার বিষয়টি লইয়াছে, সেই নবকুমারবাবুর সহিত কথা কহিতেছি।

নবকুমার এক মুহূর্তের জন্য নিরুত্তর হইলেন। কি বিষয় তাঁহার স্মরণ হইতেছিল, বলিতে পারি না। পরক্ষণেই বলিলেন, "কৃতঘ্ন বালক! তোর পিতা নিজ দোষে জমিদারী হারাইয়াছে, অনাথকে এতদিন পালন করিলাম, তাহার এই ফল! আজ শ্রীশকে

ডুবাইয়াছিলি, কাল আমার গলায় ছুরি দিবি। তুই আজই আমার বাড়ি হইতে দূর হ।"

নরেন্দ্র। চলিলাম। কিন্তু যদি ইহজন্মে কি পরজন্মে বিচার থাকে, তুমি তাহার ফলভোগ করিবে।

সায়ংকালে গঙ্গাতীরে হেমলতা একাকী বিচরণ করিতেছিল। যে যে ঘটনা হইয়াছিল, হেমলতা সমস্ত শুনিয়াছিল। হেমলতাকে দেখিয়া নরেন্দ্র একবার দাঁড়াইল; দেখিল, হেম চক্ষুতে বস্ত্র দিয়া ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিতেছে।

নরেন্দ্রের ক্রোধ গেল, সে হেমের নিকট আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "হেম, তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

কাতরস্বরে হেম উত্তর করিল, "নরেন্দ্র, নরেন্দ্র, আমার হাত ছাড়িয়া দাও। শ্রীশকে আমি দাদার ন্যায় মান্য করি, তাহাকে তুমি জলে ফেলিয়া দিয়াছিলে? আমার পিতাকে তুমি কালসর্প বলিয়া গালি দিলে? আমাদের তুমি ঘৃণা কর? নরেন্দ্র! আমার হাত ছাড়িয়া দাও।"

শ্রীশকে জলে ফেলিয়া দিয়াও ক্রুদ্ধ নরেন্দ্রের সংজ্ঞা হয় নাই, নবকুমারের তিরস্কারেও তাহার সংজ্ঞা হয় নাই, কিন্তু এখন হেমের চক্ষুতে জল দেখিয়া ও বালিকার কয়েকটি কাতর কথা শুনিয়া নির্বোধ যুবকের সংজ্ঞা হইল। ধীরে ধীরে হেমের চক্ষুর জল মুছাইয়া দিয়া, ধীরে ধীরে তাহার হাত ধরিয়া, নরেন্দ্র কাতর-স্বরে বলিল, "হেম, ক্ষমা কর, আমি অপরাধ করিয়াছি। শ্রীশ শান্ত, ধীর ও নির্দোষ, তাহাকে জলে ফেলিয়া দিয়া আমি নির্বোধের ন্যায় কার্য করিয়াছি; তোমার পিতাকে গালি দিয়া আমি চণ্ডালের ন্যায় কার্য করিয়াছি: কিন্তু হেম, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, তুমি ভিন্ন স্নেহ-পূর্বক কথা কহিবার এ জগতে আমার আর কেহ নাই। আজি আমি দেশত্যাগী হইতেছি, যাইবার পূর্বে তোমার দুইটি স্নেহের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। হেম, আমাকে ক্ষমা কর।"

হেম ক্ষমা করিল, নরেন্দ্রকে গঙ্গাতীরে বসাইল, আপনি নিকটে

বসিল, অশ্রুজল মুছিয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিল। "নরেন্দ্র, কেন দেশত্যাগী হইতেছ? পিতা রাগ করিয়া একটি কথা বলিয়াছেন বলিয়া, নরেন্দ্র কেন বীরনগর ত্যাগ করিবে? হেম নিজে পিতার নিকট অনুরোধ করিয়া পিতার ক্রোধ অপনোদন করিবে, নরেন্দ্র, তুমি বীরনগর ছাড়িয়া যাইও না।"

কিন্তু হেমলতার এ অনুনয় ব্যর্থ হইল। উদ্ধত নরেন্দ্র হেমলতার অশ্রুজল দেখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু তাহার হৃদয়ে আজ যে ব্যথা লাগিয়াছে, তাহার শান্তি নাই। নরেন্দ্র বলিল, "হেমলতা, তোমার অনুরোধ বৃথা, বস্তুতঃ বীরনগরে আমার স্থান নাই। কয়েক মাস অবধি আমি এই পৈতৃক ভবনে যে যাতনা ভোগ করিতেছি, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না, সে যাতনা তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসার জন্য সহ্য করিয়াছি। যে দেশে আমার প্রাতঃস্মরণীয় পিতা রাজা ছিলেন, সে দেশে পরপালিত, ঘৃণিত পদদলিত হইয়া বাস করিয়াছি, সে কেবল তোমার স্নেহের জন্য। হেম, তোমারই স্নেহের জন্য, তোমার ভালবাসার জন্য, তোমারই আশায় এতদিন ছিলাম, সে আশাও সাঙ্গ হইয়াছে। আশা ছিল, তোমার পিতা আমার সহিত তোমার বিবাহ দিবেন। আমার কথায় রাগ করিও না, লজ্জা করিও না, লজ্জা বা রাগ করিবার এখন সময় নাই। তোমার পিতার মন বুঝিয়াছি, বিনীত শ্রীশচন্দ্রকে তিনি স্নেহ করেন, আমি তাঁহার চক্ষের শূল। শ্রীশচন্দ্রকে তিনি কন্যাদান করিবেন, তাহা কি আমি চক্ষে দেখিব? তাহা দেখিয়া এই গৃহে বাস করিব? হেমলতা, হেমলতা, মনুষ্য সে আঘাত সহ্য করিতে পারে না, অথবা মুনি-ঋষির সেরূপ সহিষ্ণুতা আছে। হেমলতা, আমি ঋষি নহি। হেম আমাকে বিদায় দাও, বীরনগরে আমার স্থান নাই।"

ক্ষণেক পরে নরেন্দ্র পুনরায় ধীরস্বরে কহিতে লাগিল, "হেমলতা, কাঁদিও না, সমস্ত জীবন কাঁদিবার সময় আছে, একবার আমার কথা শুন। আমি আজি জন্মের মত চলিলাম। কোথায় যাইতেছি
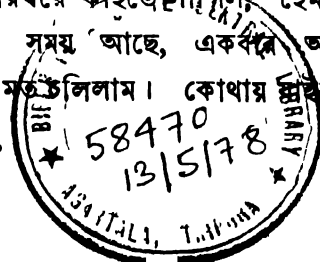
কি করিব, তাহা আমি জানি না। কিন্তু সে চিন্তা করি না, জগতে লক্ষ লক্ষ প্রাণী রহিয়াছে, আমারও থাকিবার স্থান হইবে। কিন্তু এই জনাকীর্ণ জগতে আমি আজ হইতে একাকী। নানা দেশে নানা স্থানে অনেক লোক দেখিব, তাহাদের মধ্যে আমি বন্ধুশূন্য, গৃহশূন্য, একাকী। জীবনে নরেন্দ্রকে আপনার ভাবিবে, এরূপ লোক নাই, নরেন্দ্রের মৃত্যুকালে শোক করিবে, এরূপ লোক নাই।"

হেমলতার চক্ষুজলে বস্ত্র, শরীর সিক্ত হইতেছিল, এক্ষণে আর থাকিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। নরেন্দ্রের চক্ষু উজ্জ্বল, কিন্তু জলশূন্য, নরেন্দ্র আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "হেম, ক্ষণেক স্থির হও, কাঁদিও না, আমি এক্ষণে কাঁদিতে পারি না। আমার মনে যে ভাব হইতেছে, তাহা ক্রন্দনে ব্যক্ত হয় না; হেম, তুমি আমাকে ভালবাস, জগতের মধ্যে কেবল তুমি এক একবার নরেন্দ্রের প্রতি সস্নেহ-দৃষ্টিতে দেখ, নরেন্দ্রের বিষয় সস্নেহ-চিত্তে ভাব; কিন্তু নরেন্দ্র তোমাকে কিরূপ গাঢ় প্রণয়ের সহিত ভালবাসে, অন্ধকার, সুখশূন্য জীবনাকাশের মধ্যে একটি প্রণয়-তারার প্রতি কিরূপ সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া থাকে, তাহা হেমলতা, জান না, বালিকার হৃদয় সে ভাব ধারণ করিতে পারে না; কিন্তু এ স্বপ্ন অদ্য সাঙ্গ হইল, জীবনের একমাত্র আলোক নির্বাণ হইল, অদ্য হইতে অন্ধকারে দেশে-দেশে, অরণ্যে-অরণ্যে যাবজ্জীবন পরিভ্রমণ করিব।"

নরেন্দ্র ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; পরে ধীরে ধীরে বলিল, "হেমলতা, আমার আর একটি কথা আছে। বাল্যকালে আমরা দুজনে এই মাধবীলতাটি পুতিয়াছিলাম, আমাদের ভালবাসার ন্যায় লতাটি বাড়িয়াছে, আজ আর ইহার থাকিবার আবশ্যক কি?"

নরেন্দ্র সেই লতাটি উৎপাটন করিল ও তদ্দারা একটি কঙ্কণ প্রস্তুত করিল, ধীরে ধীরে হেমলতাকে তাহা পরাইয়া দিয়া বলিল, "হেম, ফুল যত শীঘ্র শুকায়, লতা তত শীঘ্র শুকায় না, বোধ হয়, তুমিও আমাকে কিছুদিন স্মরণ রাখিবে। যদি রাখ, যতদিন

নরেন্দ্রের জন্য তোমার স্নেহ থাকিবে, ততদিন এই মাধবীকঙ্কণটি রাখিও, যখন অভাগাকে ভুলিয়া যাইবে, নদীজলে শুষ্কলতা ফেলিয়া দিও।”

শোকবিহ্বলা দগ্ধহৃদয়া হেমলতা বিস্মিত হইয়া নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখিল, নরেন্দ্র স্থির। নরেন্দ্রের স্বর গম্ভীর ও অকম্পিত। নরেন্দ্রের চক্ষুতে জল নাই, কিন্তু অগ্নি জ্বলিতেছে। ধীরে ধীরে হেমের হাত ছাড়িয়া নরেন্দ্র চলিয়া গেল। সে অন্ধকার রজনীতে আর নরেন্দ্রকে দেখা গেল না

॥ ছয় ॥

সায়ংকালীন অন্ধকারাচ্ছন্ন গঙ্গাতীরে বসিয়া একটি ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা অসংখ্য উর্মিরাশির দিকে কিজন্য চাহিয়া রহিয়াছে? যতদূর অন্ধকারে দেখা যায়, বীচিমালা উঠিতেছে, পড়িতেছে, তাহার পর একটি ঈষৎ ধূসর রেখা, তাহার পর আর অন্ধকারে দেখা যায় না। দেখিতে দেখিতে হেমের চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল, হেম কিছু দেখিতে পাইল না। রজনী গাঢ় হইয়া আসিল, ক্রমে আকাশে তারা ফুটিতে লাগিল; তথাপি হেমের দেখা শেষ হইল না।

রজনীতে জমিদারের বাড়ির সকলে নিদ্রিত হইল। হেমলতার পক্ষে সে রজনী কী ভীষণ! বালিকা ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া গবাক্ষের নিকট আসিল, ধীরে ধীরে গবাক্ষ উদ্‌ঘাটন করিয়া বাহিরে দেখিল; তারা-পরিপূর্ণ অন্ধকার আকাশের নীচে বিশাল গঙ্গা অনন্তস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। সেই নৈশ-গঙ্গার দিকে দেখিতে দেখিতে কি হৃদয়বিদারক ভাব হেমলতার হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল। বাল্যকালের ক্রীড়া, কিশোর-বয়সের প্রথম ভালবাসা, কত কথা, কত কৌতুক একে একে জাগরিত হইয়া বালিকাহৃদয় দলিত করিতে লাগিল। এক একটি কথা মনে হয়, আর হৃদয়ে দুঃখ উথলিয়া উঠে, অবিরল অশ্রুধারায় চক্ষু ও

বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়। আবার বালিকা শান্ত হইয়া গঙ্গার দিকে দেখে, আবার একটি কথা স্মরণ হয়, আবার শোকবিহ্বলা হইয়া অজস্র রোদন করে; কাঁদিয়া কাঁদিয়া বালিকা অবসন্ন হইল, হায়! সে ক্রন্দনের শেষ নাই, সে ক্রন্দন অবারিত, অশান্তিপ্রদ। রজনী একপ্রহর, দ্বিপ্রহর হইল, তথাপি বালিকা গবাক্ষের নিকট দণ্ডায়মানা অথবা ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া নীরবে রোদন করিতেছে।

শোকের প্রথম বেগের উপশম হইল, কিন্তু শোকচিন্তা-পরম্পরা নিবারণ হইবার নহে। গণ্ডস্থলে হাত দিয়া একাকিনী গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া হেমলতা ভাবিতে লাগিল। এক একবার হেমলতার নয়নে একবিন্দু জল আসিতে লাগিল, ধীরে ধীরে সেটি গড়াইয়া পড়িল, আবার একবিন্দু জড় হইতে লাগিল। সে বিন্দু-পরম্পরা শুকায় না, সে চিন্তা-পরম্পরা শেষ হয় না।

রজনী শেষ হইল, পূর্বাকাশে রক্তিমচ্ছটা দেখা যাইতে লাগিল, মলিনা বালিকা তখনও গণ্ডে হস্ত দিয়া গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া আছে, তখনও চিন্তা-সূত্র শেষ হয় নাই। জীবনে কি শেষ হইবে?

রজনী প্রভাত হইল, প্রথম সূর্যালোকে হেমলতা চকিত হইয়া উঠিল। চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট, বদনমণ্ডল মলিন, শরীর অবসন্ন। ধীরে ধীরে বালিকা গবাক্ষপার্শ্ব হইতে উঠিল, শূন্য-হৃদয়ে শূন্যগৃহে গৃহকার্যে প্রবৃত্ত হইল।

সেই কি একদিন? দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে বালিকা সেই গবাক্ষপার্শ্বে বসিত, যে গঙ্গাতীরে নরেন্দ্র বিদায় লইয়াছে, সেই গঙ্গার দিকে দেখিত। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে গভীর রজনীতে শূন্যহৃদয়া বালিকা সেই গঙ্গার দিকে চাহিয়া থাকিত, কত ভাবিত, কত কথা মনে আসিত, কে বলিবে? একদিন নরেন্দ্রনাথ হেমের কানে কানে কি বলিয়াছিল, একদিন ওপার হইতে হেমের জন্য কি আনিয়াছিল, একদিন গাছ হইতে আম্র পাড়িয়া হেম ও নরেন লুকাইয়া খাইয়াছিল, একদিন পিতাকে না বলিয়া হেম সন্ধ্যার সময় নরেন্দ্রের সহিত নৌকায় চড়িয়াছিল, একদিন হেম

নরেন্দ্রকে ফুলের মালা পরাইয়া দিয়াছিল, একদিন নরেন্দ্র হেমের কেশ ফুল দিয়া সাজাইয়া দিয়াছিল, সহস্র সহস্র কথা একে একে নদীজলের হিল্লোলের ন্যায় হেমের হৃদয়ে উঠিত। দ্বিপ্রহর হইতে সায়ংকাল পর্যন্ত, কখন কখন সন্ধ্যা হইতে গভীর রজনী পর্যন্ত হেমলতা ভাবিত, এক একবার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইত, পাছে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে বালিকা জল মুছিয়া ফেলিত। নবকুমারের বিপুল সংসারে সে দুঃখের ভাগিনী কে হইবে? হেম কাহাকেও মনের কথা মুখ ফুটিয়া বলিত না। বালিকা সকলের নিকটেই সঙ্গোপন করিত, বাড়ীর লোকদিগের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া ভাবিত। কখন কখন শোক-পারাবার উথলিলে গোপন করিতে পারিত না, নয়ন হইতে অবিরল বারিধারা বহিত।

ক্রমে বসন্তকালের পর গ্রীষ্মকাল আসিল। প্রকৃতি বঙ্গদেশকে সুস্বাদু ফল, সুদৃশ্য ফুল, সুকণ্ঠ পক্ষী দ্বারা পরিপূর্ণ করিল। নবপল্লবিত বৃক্ষগণ সুমন্দ বায়ুতে মধুর গান করিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সুন্দর পক্ষিগণ আনন্দে গান করিয়া নিজ নিজ কুলায় নির্মাণ করিতে লাগিল। মধ্যাহ্নে ছায়াপ্রদায়ী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া, পত্রের মর্ম্মর শব্দ শুনিয়া, পক্ষিশাবক ও পক্ষিদম্পতীর দিকে চাহিয়া বালিকা হস্তে গণ্ড স্থাপন করিয়া চিন্তা করিত, যতক্ষণ না সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া সেই বৃক্ষাবলী আবৃত করিত, হেমলতার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইত না। তাহার পর বর্ষা আসিয়া সমস্ত দেশ প্লাবিত করিল, বর্ষা শেষ হইল। কৃষকগণ আনন্দে ধান্য কাটিতে লাগিল। গ্রামে, গৃহে, গোলায় ধান্য পরিপূর্ণ হইল। জগৎ আনন্দিত হইল, কিন্তু হেমের নিরানন্দ হৃদয় শান্ত হইল না। সুন্দর আশ্বিন মাসে পূজার রব উঠিল, চারিদিকে আনন্দধ্বনি উঠিল, আকাশ পরিষ্কার হইল, কিন্তু হেমলতার হৃদয়াকাশ তমসাচ্ছন্ন। আবার শীতকাল আসিল, আনন্দে কৃষকগণ আবার ধান্য কাটিল, আনন্দে সংসারী, গৃহস্থ, ধনী, কাঙ্গালী সকলেই পৌষ-পার্বণ করিল, হেমলতার পার্বণের দিন কি ইহজন্মে আর আসিবে?

নবকুমারের বিপুল সংসার। কাহারও কিছু ক্ষোভ নাই, অভাব নাই, দুঃখ নাই। সেই সংসারে স্নেহপালিতা একমাত্র দুহিতা বিষণ্ণা। বিপুল সংসারেও হেমলতা একাকিনী।

॥ সাত ॥

নরেন্দ্র অতিশয় সন্তরণপটু ছিলেন, সেই রাত্রিতে সন্তরণ দিয়া গঙ্গা পার হইয়া অপর পারে উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে অনেক দূর পর্যন্ত কেবল বালুকা, তাহার পর কেবল অনন্ত প্রান্তর দেখা যাইতেছে। নরেন্দ্র সেই অন্ধকার নিশীথে সিক্তশরীর ও সিক্তবস্ত্রে সেই বালুকা-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র গঙ্গার অপর পার্শ্বের দিকে দৃষ্টি করিলেন। অন্ধকারেও বীরনগরের শ্বেতপ্রাসাদ ঈষৎ দৃষ্টি হইতেছে, নরেন্দ্র সেইদিকে দেখিলেন, আবার চক্ষু ফিরাইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। আবার স্থির হইয়া সেইদিকে চাহিলেন। নিস্তব্ধ অন্ধকারে গঙ্গার কল্‌কল্‌ শব্দ শুনা যাইতেছে, সময়ে সময়ে পেচকের ভীষণ রব শুনা যাইতেছে, আর এক একবার দূরে শৃগালের কোলাহল শ্রুত হইতেছে। নরেন্দ্র গঙ্গা দেখিতেছিলেন না, নরেন্দ্র পেচক বা শৃগালের ধ্বনি শুনিতেছিলেন না, তিনি নিঃশব্দে অন্ধকারে বিচরণ করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পর আবার বীরনগরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ঘোর অন্ধকারে আর সে গৃহ দেখা যায় না। নরেন্দ্র একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ফিরিলেন। সম্মুখে যে পথ পাইলেন, সেইদিকে চলিলেন।

কোথায় যাইতেছেন নরেন্দ্র জানেন না। উপরে অসীম গগন, নীচে অসীম প্রান্তর, নরেন্দ্রের চিন্তাও অসীম ও অনন্ত, নরেন্দ্র যেদিকে পাইলেন চলিলেন। পথ-পার্শ্বে বটবৃক্ষ হইতে নিশাচর পক্ষী নরেন্দ্রকে দেখিয়া কুলায় ছাড়িয়া পলায়ন করিল, নিশাবিহারী শৃগালপাল নরেন্দ্রকে দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, নরেন্দ্র তাহা গ্রাহ্য করিলেন না।

অনেক দূরে যাইয়া একটি গ্রামে আসিলেন। গ্রাম নিস্তব্ধ, সকলেই সুপ্ত। কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষশ্রেণীর নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে ও বৃক্ষপত্রমধ্যে কোন কোন স্থানে খদ্যোতমালা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। নরেন্দ্রকে দেখিয়া গ্রাম্যকুকুর শব্দ করিতে লাগিল ; দুই একজন গৃহস্থ ঘরের দ্বার খুলিয়া চাহিয়া দেখিল ; নরেন্দ্র কোনদিকে চাহিলেন না, পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। গ্রামের পথ ঠিক জানেন না, স্থানে স্থানে বৃক্ষের নীচে ও ঝোপের ভিতর দিয়া যাইতে নরেন্দ্রের শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইল। নরেন্দ্র গ্রাহ্য করিলেন না, কতক্ষণে গ্রাম পার হইয়া আবার এক প্রান্তরে পড়িলেন।

আবার প্রান্তর পার হইলেন, অন্য গ্রামে পড়িলেন। আবার নিঃশব্দে গ্রাম পার হইয়া গেলেন। সেই রজনীযোগে কত গ্রাম অতিক্রম করিলেন, কত দূরে যাইলেন, জানি না, নরেন্দ্রও বলিতে পারেন না।

সমস্ত রজনী ভ্রমণ করিয়া নরেন্দ্রনাথ দূর প্রান্তরে একটি আলোক দেখিতে পাইলেন, সেই আলোক অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন, প্রায় এক ক্রোশ যাইয়া আলোকের নিকট পৌঁছিয়া দেখিলেন, কতকগুলি লোক একটি শবদাহ করিতেছে। নরেন্দ্রনাথ তখন একবার দাঁড়াইলেন। শব দেখিয়া একবার দাঁড়াইলেন। কাষ্ঠের অগ্নি একবার জ্বলিয়া উঠিতেছিল ; আবার মধ্যে মধ্যে নিস্তেজ হইয়া যাইতেছিল। ঐরূপ স্তিমিত আলোকে নরেন্দ্রের আকৃতি ও বিকট মুখমণ্ডল এক একবার দেখা যাইতে লাগিল। যাহারা শবদাহ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইল ; শ্রান্ত পথিক মনে করিয়া নিকটে আসিতে বলিল, নরেন্দ্র নিকটে গেলেন না ; পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, নরেন্দ্র পরিচয় দিলেন না। শবদাহিগণ ক্ষণেক নরেন্দ্রের অচল, দীর্ঘ অবয়ব ও বিকৃত মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শব ছাড়িয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

প্রত্যূষে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা কলস লইয়া ঘাটে যাইতেছিল,

এক দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ বিকৃত মনুষ্যমূর্তি পথে শয়ান দেখিয়া সভয়ে পাশ কাটিয়া গেল।

প্রাতঃকাল হইল। গ্রামের লোক সমবেত হইয়া অপরিচিত ঘোর নিদ্রাভিভূত পুরুষকে জাগাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "আমার নাম নাই, আমার নিবাস নাই, আমি জগতে একাকী।" নরেন্দ্র ঘোর উন্মত্ত।

॥ আট ॥

নরেন্দ্র সেইদিনই পীড়াক্রান্ত হইলেন, গ্রামের একজন ভদ্রলোক তাঁহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, কিন্তু অনেকদিন তাঁহার জীবনের আশা ছিল না। অনেকদিন পর নরেন্দ্র ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। যখন চলিবার শক্তি হইল, তখন সেই ভদ্রলোককে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া নরেন্দ্র সে গ্রাম ত্যাগ করিলেন।

প্রথম শোক ও নৈরাশ্যের বেগ তখন ক্ষান্ত হইয়াছে, নরেন্দ্র হেমলতাকে ফিরিয়া পাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, সুবাদারের নিকট আপন বিষয় পাইবার আবেদন করিব। পৈতৃক জমিদারী আমার হইলে স্বার্থপর নবকুমার অবশ্যই আমাকে কন্যাদান করিবেন।

এই উদ্দেশ্যে নরেন্দ্র সুবাদার সুজার রাজধানীতে পৌঁছিলেন। সম্রাট শাজাহানের পুত্র সুজা বঙ্গদেশের শাসনকার্যে নিযুক্ত হইয়া রাজধানী ঢাকা হইতে রাজমহলে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন এবং বিংশতি বৎসর সুশাসন দ্বারা বঙ্গদেশে যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে দেশে প্রায় যুদ্ধ বা কোনরূপ উপদ্রব হয় নাই, প্রজাবর্গ নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছিল। ইতিহাসে তাঁহার অনেক সুখ্যাতি দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যুদ্ধে যেরূপ বিক্রমশালী ও সাহসী ছিলেন, অন্য সময়ে সেইরূপ ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন। তাঁহার দয়া ও ন্যায়পরতা দেখিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে

কি জমিদার, কি জায়গীরদার সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। কথিত আছে, তাঁহার মৃত্যুর সময়ে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহার জন্য খেদ করিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার উদারস্বভাব দুই একটি দোষে কলঙ্কিত ছিল। যুদ্ধের সময় তিনি যেরূপ সাহসী, অন্য সময়ে তিনি সেইরূপ বিলাসী। সুজা নিরতিশয় সুশ্রী পুরুষ ছিলেন এবং সর্বদাই সুন্দরী রমণী-মণ্ডলীতে পরিবৃত থাকিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার প্রধান রাজ্ঞী প্যারীবানু বঙ্গদেশে রূপে, গুণে ও চতুরতায় অদ্বিতীয়া বলিয়া খ্যাতা ছিলেন। তিনি বাক্‌পটুতা ও সুমধুর কৌতুকে সর্বদাই সুবাদারের হৃদয় প্রেমরসে সিক্ত করিয়া রাখিতেন। কিন্তু প্যারীবানুও সুজার একমাত্র প্রণয়ভাগিনী ছিলেন না, শত শত বেগম উদ্যানস্থিত পুষ্পের ন্যায় সুজার রাজমন্দির আলো করিয়া থাকিত। তাহাদের রূপে বিমোহিত হইয়া সুজা রাজকার্য্য বিস্মৃত হইতেন, কখন কখন দুই তিন দিন ক্রমান্বয়ে মদ্যপান ও আমোদে অতিবাহিত করিতেন।

নরেন্দ্রনাথ সুবাদারের নিকট আবেদন করিতে যাইলেন। এরূপ সুবাদারের নিকট উচিত বিচার-প্রত্যাশা সম্ভব নহে। গঙ্গাতীরে সুন্দর রাজমহল নগরী এখনও দেখিতে মনোহর, কিন্তু যখন বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, তখন রাজমহলের শোভা অতুলনীয় ছিল। সুবাদারের উচ্চ প্রাসাদ ও রাজবাটী, ওমরাহ ও জায়গীরদারদিগের সুদৃশ্য হর্ম্যাবলী এবং বঙ্গদেশের সমস্ত ধনাঢ্য লোকের সমাগমে রাজমহল যথার্থ রাজপুরী বোধ হইত। স্বয়ং গঙ্গা সহস্র ধনাঢ্য বণিকের সহস্র পোত বক্ষে ধারণ করিয়া নগরের শোভা ও সমৃদ্ধি বর্ধন করিত। প্রশস্ত রাজপথে যুদ্ধবিলাসী গর্বিত ওমরাহ ও মুসলমান জমিদারগণ সর্বদাই অশ্ব, হস্তী অথবা শিবিকায় গমন করিত। হিন্দু বণিক ব্যবসায়ী লোক শান্তভাবে নগরের একপার্শ্বে বাস করিত ও নিজ নিজ ব্যবসায়ে রত থাকিত।

এ সমস্ত দেখিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ রাজমহলে যান নাই, এ সমস্ত দেখিয়া তিনি শান্ত হইলেন না; কিরূপে সুবাদারের নিকট

আবেদন জানাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক ধনাঢ্য হিন্দুবণিক্ নরেন্দ্রের পিতাকে চিনিতেন, কিন্তু নরেন্দ্র এক্ষণে দরিদ্র, দরিদ্রের জন্য কে চেষ্টা করে? নরেন্দ্র যাঁহার নিকট যাইলেন, তিনিই বলিলেন, "হাঁ বাপু, তোমার পিতা মহাশয় লোক ছিলেন, তাঁহার পুত্রকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম, কয়েকদিন এইস্থানে অবস্থিত কর, পরে দেখা যাইবে," ইত্যাদি। নরেন্দ্র বিফল প্রযত্ন হইয়া রহিলেন।

অনেকদিন পর ঘটনাক্রমে এর্‌ফান খাঁ নামক কোন মোগল জায়গীরদারের সহিত নরেন্দ্রের পরিচয় হইল। এর্‌ফান খাঁ বীরেন্দ্রের পরম বন্ধু এবং যথার্থ মহাশয় লোক ছিলেন, তিনি সাদরে নরেন্দ্রকে আহ্বান করিয়া সত্বর তাঁহার জন্য সুবাদারের নিকট যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তথাপি দরিদ্রের আবেদন বিচারাসন পর্যন্ত যায় না, অনেক যত্নে, অনেকদিন পরে এর্‌ফান খাঁ বহু অর্থে সুবাদার ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গের মন পরিতুষ্ট করিয়া একদিন নরেন্দ্রনাথের আবেদন সুজার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

সুন্দর রৌপ্য ও স্বর্ণখচিত সিংহাসনে সুবাদার বসিয়াছেন, রাজবেশ সে সুন্দর অবয়বে বড় সুন্দর শোভা পাইতেছে। চারিদিকে অমাত্য ও বড় বড় আফগান ও মোগল যোদ্ধৃগণ শির নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ও বহুবিধ লোকে বিস্তীর্ণ বিচার-প্রাসাদ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। প্রস্তরবিনির্মিত সারি সারি স্তম্ভের উপর চারুখচিত ছাদ শোভা পাইতেছে, সিংহাসনের দুইদিকে পরিচারক চামর দুলাইতেছে। প্রাসাদের বাহিরে যতদূর দেখা যায়, লোকে সমাকীর্ণ, সুবাদার সর্বদা দেখা দেন না, সেইজন্য অদ্য সকলেই দেখিতে আসিয়াছে।

সুবাদারের সম্মুখে বৃদ্ধ এর্‌ফান খাঁ উঠিয়া আবেদন করিলেন, "জাঁহাপনা, এ দাস প্রায় বিংশতি বৎসর সম্রাটের কর্ম করিয়াছে, সুবাদারের কার্যে আমার কেশ শুক্ল হইয়াছে, ললাট খড়্গে ক্ষত হইয়াছে। গোলামের কিঞ্চিৎ আবেদন আছে।"

সুবাদার বলিলেন, "এর্‌ফান, তুমি আমাদের প্রধান অনুচর ও অতিশয় প্রিয়পাত্র, তোমার এমন কি যাচ্ঞা আছে, যাহা আমাদের অদেয় ?"

এর্‌ফান ভূমি পর্যন্ত শির নোয়াইয়া পুনরায় বলিলেন, "জাঁহাপনা ! বঙ্গদেশবাসিগণ অতি দুর্বল; তাহাদের মধ্যে সময়ে সময়ে যে পরাক্রান্ত জমিদারগণ আমাদিগের যুদ্ধে সাহায্য করে, তাহারা সুবাদারের প্রীতিভাজন সন্দেহ নাই। জমিদার বীরেন্দ্র সিংহ একজন সেইরূপ লোক ছিলেন।"

সুবাদার বলিলেন, "হাঁ, আমি সেই হিন্দুর নাম শুনিয়াছি, পাঠানদিগের সহিত আমাদের যুদ্ধে সে সাহায্য করিয়াছিল।"

এর্‌ফান পুনরায় তসলীম করিয়া বলিল, "জাঁহাপনা! যাহা কহিলেন, যথার্থ। এই দাস যখন উড়িষ্যার যুদ্ধে গিয়াছিল, স্বচক্ষে বীরেন্দ্রের যুদ্ধ-কৌশল ও রাজভক্তি দেখিয়াছিল। এই রাজসভায় অনেক পরাক্রান্ত পাঠান ও মোগল যোদ্ধা আছেন; কিন্তু বীরেন্দ্র অপেক্ষা অধিক সাহসী পুরুষ এ গোলাম এ পর্যন্ত দেখে নাই।"

সভাস্থদিগের কোষে অসি ঝন্‌ঝনার শব্দ হইল, মুসলমানদিগের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু সুজা সহাস্যবদনে বলিলেন, "এর্‌ফান, তুমি কাফেরের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছ, তা অযথার্থ নহে, সে হিন্দু যথার্থ সাহসী ছিল শুনিয়াছি। এক্ষণে তাহার জন্য কি বলিবার আছে বল, তোমার উপরোধে আমি তাহাকে যে-কোন পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছি।"

এর্‌ফান গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "যিনি সুবাদারের উপর সুবাদার, বাদশাহের উপর বাদশাহ, তিনিই কেবল এক্ষণে বীরেন্দ্রকে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে পারেন। আমি তাঁহার অনাথ বালকের জন্য আবেদন করিতেছি। বালক এক্ষণে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে, কানঙ্গু মহাশয়ের যোগে এক শঠ তাহার পৈতৃক জমিদারী কাড়িয়া লইয়াছে।"

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া সুবাদার কানঙ্গুকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সে সময় সমস্ত খাজনা ও জমিদারীর বিষয় কানঙ্গু মহাশয়ের হস্তে থাকিত; এমন কি, বঙ্গদেশের সুবাদার যে সমস্ত কাগজাৎ দিল্লীতে পাঠাতেন, তাহাও কানঙ্গুর সহি না হইলে গ্রাহ্য হইত না। কানঙ্গু মহাশয় নবকুমারের অর্থভোগী, বিনীতভাবে তিনি বলিলেন, "সুবাদার মহাশয়ের আদেশ আমাদের শিরোধার্য; বীরেন্দ্রের মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর খাজনা আদায় না হওয়ায় জাঁহাপনা সেই জমিদারী নবকুমারকে দিতে আদেশ দিয়াছিলেন।"

সুজাকে কোন বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন ছিল না, কানঙ্গু মহাশয় যাহা বুঝাইলেন, সুবাদার তাহাই বুঝিলেন, এর্‌ফানের আবেদন ফাঁসিয়া গেল। এর্‌ফান রোষে নতশির হইয়া রহিলেন, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া নরেন্দ্র কানঙ্গু মহাশয়ের দিকে তীব্রদৃষ্টি করিতেছিলেন।

সুবাদার শেষে বলিলেন, "এর্‌ফান খাঁ! সূর্য যে রশ্মি জগতে দান করেন, তাহা ফিরাইয়া লন না, জমিদারী স্বয়ং দান করিয়া ফিরাইয়া লওয়া রাজধর্ম নহে; বীরেন্দ্রের বালক তেজস্বী দেখিতেছি, বীরেন্দ্রের মত যুদ্ধব্যবসায় শিক্ষা করুক, অবশ্যই উৎকৃষ্ট পুরস্কার ও অন্য জমিদারী এনাম পাইবে।"

সভাস্থ সকলে "কেরামৎ" "কেরামৎ" বলিয়া সুবাদারের কথার প্রশংসা করিল; এর্‌ফান অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া সেইদিন হইতেই নরেন্দ্রকে নিকটে রাখিয়া যুদ্ধব্যবসায় শিখাইতে লাগিলেন।

॥ নয় ॥

পূর্বোক্ত ঘটনার তিন বৎসর পর ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে আশ্বিন মাসের প্রারম্ভে একদিন ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী আগ্রানগরে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। আগ্রার রাজদ্বার লোকে সমাকীর্ণ, সমস্ত নগরবাসী ভীত ও শশব্যস্ত, বাজার-দোকান সমস্ত বন্ধ, ওমরাহ, মন্‌সবদার, রাজপুত, মোগল, পাঠান, সকলেই অস্থিরচিত্ত ও চিন্তাবিহ্বল।

কার্যকর্ম বন্ধ হইল, সকলেই ভীত ও উৎসুক। সম্রাট্ শাজাহান কয়েকদিন অবধি পীড়ায় শয্যাগত ছিলেন; আজি সংবাদ রটনা হইল যে তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

মিথ্যা সংবাদে শীঘ্রই সমুদয় ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন হইল। বঙ্গদেশ হইতে সুজা, দক্ষিণ হইতে আরংজীব, গুজরাট হইতে মুরাদ রণসজ্জায় বহিষ্কৃত হইলেন; পিতৃবিয়োগে সকলেই সিংহাসনারোহণে লোলুপ হইলেন। পরে যখন প্রকৃত সংবাদ জানা গেল যে, শাজাহান জীবিত আছেন, তখন রাজপুত্রগণ রণোদ্যম হইতে নিরস্ত হইলেন না। তাহার এক কারণ এই যে, ইতিপূর্বে কয়েক মাস হইতে সম্রাট্ পীড়াবশতঃ রাজকার্য করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা এই অবসরে সমস্ত রাজকার্য আপনি করিতে লাগিলেন, কোন বিষয়ে পিতার মত লইতেন না, জন্মের মত পিতাকে রুদ্ধ রাখিয়া আপনি রাজকার্য করিবেন, এইরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ শঙ্কা করিয়াছিল যে, বিষপ্রয়োগ দ্বারা যুবরাজ আপন সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করিবেন। দারার ভ্রাতৃগণ পিতার শাসনে সম্মত ছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শাসনে সম্মত ছিলেন না, এইজন্য সমগ্র ভারতবর্ষে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইল।

১৬৫৭ খৃঃ অব্দের শেষে বারাণসীর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধক্ষেত্র শীতকালের সায়ংকালীন আলোকে ভীষণ রূপ ধারণ করিয়াছে। অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র ও মনুষ্যের শবরাশিতে ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কোথাও মৃতদেহসমুদয় পড়িয়া যেন আকাশের নক্ষত্রের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিতেছে; কোথাও মুমূর্ষু অবস্থায় অঙ্গহীন সিপাহী ক্ষীণস্বরে "জল—জল" করিয়া চীৎকার করিতেছে; কোথাও দুই একজন সেনা নিজ নিজ ভ্রাতা বা বন্ধুর অনুসন্ধান করিতেছে। হায়! এ জগতে আর তাহাদিগকে ফিরিয়া পাইবেন না। দুই একজন তস্কর বহুমূল্য বস্ত্র বা স্বর্ণালঙ্কার বা অস্ত্রাদির অন্বেষণে ফিরিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে পেচকের ভীষণ রব শুনা যাইতেছে এবং শৃগালগণ মহা-কোলাহলে রব করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে আসিতেছে।

দুই এক স্থানে অগ্নিশিখা দেখা যাইতেছে ও ক্ষণে ক্ষণে আলোকচ্ছটায় ক্ষেত্র ও শবরাশি উজ্জ্বল করিতেছে। দূরে গঙ্গার পবিত্র জল কল্-কল্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে, নদীর বিশাল বক্ষস্থল শান্ত, বিস্তীর্ণ ও উজ্জ্বল; ক্ষুদ্র মানবের সুখ বা দুঃখ, জয় বা পরাজয়ে বিচলিত হয় না।

ক্রমে রজনী গভীর হইল, চন্দ্র উদিত হইল, তাহার নির্মল নিষ্কলঙ্ক কিরণে মানবের কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃগণ পরস্পরের শোণিতপানে লোলুপ হইয়া এই যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়াছে; শৃগাল, ব্যাঘ্র, ভল্লুকও স্বজাতির উপর হিংসা করে না। সেই চন্দ্রালোকে দুইজন রাজপুত কোন বন্ধুর অনুসন্ধানে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিল। একস্থানে কতকগুলি শব পড়িয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে যেন বেদনাসূচক স্বর বহির্গত হইল। রাজপুত সেনাদ্বয় দেখিল, একজন যুবক মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া শব্দ করিতেছে। হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছে ও সেই ক্ষতস্থান হইতে অনবরত শোণিত নির্গত হওয়ায় সে প্রায় অচেতন হইয়াছে, কিন্তু মৃত্যুর আশু সম্ভাবনা নাই।

যুবকের আকৃতি দেখিয়া রাজপুত দুইজন বিস্মিত হইল। বয়ঃক্রম অতিশয় অল্প, বোধহয় অষ্টাদশ বৎসরের অধিক নহে। মুখমণ্ডল অতিশয় সুন্দর ও উজ্জ্বল, যেরূপ সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা স্ত্রীলোকের সম্ভবে, পুরুষের প্রায় সম্ভবে না। চিন্তা অথবা বয়সের একটি রেখাও এ পর্যন্ত ললাটে অঙ্কিত হয় নাই, ললাট পরিষ্কার ও উন্নত। সমস্ত বদনমণ্ডল দেখিলে যোদ্ধা বলিয়া বোধ হয় না, বালক বলিয়া বোধ হয়, বাল্যাবস্থাতেই হতভাগ্য স্বজন ও স্বদেশ হইতে বহু দূরে আসিয়া আজি প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে।

রাজপুতসেনা দুইজনেরই যুদ্ধব্যবসায়ে হৃদয়ের স্বাভাবিক দয়া অনেক হ্রাস হইয়াছে, বালককে দেখিয়া তাহারা হাস্য করিয়া এইরূপে কথোপকথন করিতে লাগিল,—

প্রথম সেনা। এ বালক। এই বয়সেই যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে?

দ্বিতীয় সেনা। দেখিতেছি, সুজার পক্ষের সেনা। বালক যুদ্ধে পরাঙ্মুখ নহে, আমাদের রেখা পর্যন্ত আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছে। এ কোন্ দেশের লোক?

প্রথম সেনা। জানি না।

দ্বিতীয় সেনা। আমার বোধ হয়, বঙ্গদেশের হিন্দু। মোগল বা পাঠান হইলে এরূপ বেশ হইত না।

প্রথম সেনা। হা হা হা! সুজা এই বাঙ্গালী শিশু লইয়া মহারাজ জয়সিংহ ও সুলাইমানের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন? পুনরায় যখন আসিবেন, আমরা যুদ্ধে না আসিয়া আমাদের বালকদিগকে পাঠাইয়া দিব। চল, এখানে আর কেন? আমাদের বন্ধুর অন্বেষণ করি।

দ্বিতীয় সেনা। এ লোকটা জীবিত আছে, একটু সাহায্য করিলে বোধ হয় বাঁচিবে, ইহাকে ত্যাগ করিয়া যাইব?

প্রথম সেনা। শত্রুকে বাঁচাইতে গেলে আমাদের সময় থাকে না। আমি একদণ্ডে ইহার দফা শেষ করিতেছি।

এই বলিয়া প্রথম সেনা অসি নিষ্কাষিত করিল। দ্বিতীয় সেনা তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিল,– "না না, মুমূর্ষু লোকের প্রাণনাশ করিতে আমাদের প্রভু মহারাজ যশোবন্তসিংহ নিষেধ করিয়াছেন, তুমি যাও, আমি ইহাকে বাঁচাইব।"

প্রথম সেনা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল, দ্বিতীয় সেনা জলসেচন দ্বারা মুমূর্ষু যুবাকে জীবিত করিল। যুবা নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেখিল, চারিদিকে শব পড়িয়া রহিয়াছে, আকাশে চন্দ্র উদয় হইয়াছে, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, জগৎ নিস্তব্ধ। যুবক জিজ্ঞাসা করিল—"বন্ধু, তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, তোমার নাম কি? কোন পক্ষের জয় হইয়াছে, সুজা কোথায় গিয়াছেন?"

সেনা বলিল, "আমার নাম গজপতিসিংহ, আমি মহারাজ যশোবন্তসিংহের একজন সেনানী, এক্ষণে মহারাজ জয়সিংহের আজ্ঞাধীন। তোমার সুজা অতিশয় বিলাসপ্রিয়, তিনি এতক্ষণ

বেগমদিগের বিচ্ছেদে পীড়িত হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে বঙ্গদেশাভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন, হা--হা!"

যুবক অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া ভূমির দিকে অবলোকন করিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে বলিল,—"তুমি আমার শত্রু, কিন্তু আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, এক্ষণে আমাকে আর একটু সাহায্য কর। একটু জল দাও আর দুই এক দিন থাকিবার স্থান দাও। আমার দেশ অনেক দূর, এখানে আমার একজনও বন্ধু নাই, আমার নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। জল দাও,—জল দাও।"

নরেন্দ্রের বালকাকৃতি দেখিয়া গজপতিসিংহের দয়ার আবির্ভাব হইয়াছিল, বালকের কাতরোক্তি শুনিয়া একটু মমতা হইল, শুশ্রূষা করিয়া শিবিরে লইয়া গেলেন।

॥ দশ ॥

একটি প্রকাণ্ড শিবিরের অভ্যন্তরে দুইজন মহাবীর বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। একজন রাজপুত রাজা জয়সিংহ, অপরজন তাঁহার পরম সুহৃদ দেবের খাঁ, জাতিতে পাঠান।

রাজার বয়ঃক্রম অনেক হইয়াছে, কিন্তু এখনও মুখমণ্ডল যৌবনের তেজে পরিপূর্ণ, শরীর যৌবনের বলে বলিষ্ঠ। সে সময়ে মোগল সম্রাট্দিগের প্রধান সেনাপতি অধিকাংশই রাজপুত ছিলেন। রাজপুতদিগের বাহুবীর্যেই মোগলগণ সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সমুদয় ভারতবর্ষ শাসন করিতেন। যেখানে ঘোর বিপদ বা ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত, সেইস্থানেই রাজপুত সেনাপতি প্রেরিত হইতেন ও প্রায়ই বিজয় লাভ করিয়া আসিতেন। আখ্যায়িকা-বিবৃতকালে রাজপুতানার রাজাদিগের মধ্যে দুইজন বিশেষ ক্ষমতাশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন—রাজা জয়সিংহ ও রাজা যশোবন্তসিংহ। সম্রাট শাজাহান উভয়কেই বিশ্বাস করিতেন ও বিপত্তির সময় ইহাদিগকে রণে প্রেরণ করিতেন। সে সময়ে কি পাঠান, কি মোগল,

কোন সেনাপতিরই জয়সিংহের ন্যায় প্রতাপ, ক্ষমতা বা রণকৌশল ছিল না। তৎকালীন একজন বিচক্ষণ ও প্রসিদ্ধ ফরাসী ভারতবর্ষে অনেকদিন ছিলেন, তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, জয়সিংহের মত কার্যদক্ষ লোক সে সময়ে ভারতবর্ষে বোধ হয় আর কেহই ছিলেন না। শাজাহান ও যুবরাজ দারা যখন সুলাইমান শেখকে সুলতান সুজার বিরুদ্ধে পাঠান, সঙ্গে জয়সিংহকে তাঁহার রাজপুত সৈন্যের সহিত পাঠাইয়াছিলেন। বারাণসীর যুদ্ধে সুজা পরাস্ত হইয়া বঙ্গ-দেশাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন।

শিবিরে উজ্জ্বল দীপাবলী জ্বলিতেছে, বাহিরে প্রহরী, তাহার চারিদিকে অন্য শিবির। সে সময়ে রাজার শিবিরের মধ্যে আর কেহ ছিলেন না, কেবল রাজা ও তাঁহার সুহৃৎ দেবের খাঁ গুপ্তকথা কহিতেছিলেন।

দেবের খাঁ বলিলেন,—"যথার্থই জয়সিংহ নাম পাইয়াছিলেন, আপনি যেস্থানে, জয় সেস্থানে।"

রাজা বলিলেন,—"অদ্যকার যুদ্ধের কথা বলিতেছেন? যুদ্ধ কোথায়? বঙ্গদেশের সেনার সহিত যুদ্ধ কি যুদ্ধ? সুলতান সুজাও বঙ্গদেশে থাকিয়া বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধ?

দেবের। কিন্তু অন্য যুদ্ধের সময় সুলতান সুজা কি সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করেন নাই?

রাজা। তাহা স্বীকার করি। যুদ্ধের সময় তিনি সাহসের পরিচয় দেন, কার্যের সময় বিলাস বিস্মৃত হয়েন। কিন্তু কেবল সাহসে কি হয়, রণকৌশল জানেন না।

দেবের। সম্রাট্‌-পুত্রদিগের মধ্যে কাহার অধিক রণ-কৌশল আছে? আপনি আওরংজীবকে কি মনে করেন?

রাজা। উঃ! তাঁহার নাম করিবেন না, সেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন লোক আমি দেখি নাই, যেরূপ বীরত্ব সেইরূপ কৌশল। শুনিয়াছি, তাঁহার গতিরোধ করবার জন্য রাজা যশোবন্তসিংহ নর্মদাতীরে যাইতেছেন। যশোবন্তসিংহ রাণার জামাতা ও সেইরূপ

যোদ্ধা ও বিক্রমশালী ; কিন্তু আওরংজীবের সহিত যুদ্ধে কি হয়, জানি না। যশোবন্তের সাহস আছে, কৌশল নাই। আবার বোধ হয়,এই ভ্রাতৃবিরোধে অবশেষে আওরংজীবের জয় হইবে।

দেবের। আপনি দারাকে পরিত্যাগ করিবেন ?

রাজা। ইচ্ছামত কখনই নহে, কিন্তু যুদ্ধে যদি অবশেষে আওরংজীবের জয় হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সম্রাট্‌ বলিয়া মানিতে হইবে। আমরা দিল্লীর সম্রাটের অধীন, যিনি যখন সম্রাট্‌ হইবেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ রাজদ্রোহিতা।

দেবের। ভাল, অদ্য আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সুজাকে বন্দী করিতে পারিতেন। সুজা যখন পলায়ন করিলেন, আপনি অনায়াসে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ধরিতে পারিতেন, তাহা হইলে যুবরাজ দারাও অতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। আপনি সেরূপ করিলেন না কেন ?

রাজা। অদ্য সুজাকে পলাইতে দিয়াছি, তাহার কারণ আছে ভ্রাতায়-ভ্রাতায় যেরূপ বিজাতীয় ক্রোধ, যদি সুজাকে দারার সম্মুখে লইয়া যাইতাম, বোধ হয়, যুবরাজ তাহার প্রাণদণ্ড করিতেন অথবা তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ রাখিতেন। তাহা কি বিধেয় ? বিশেষ, আমি এই যুদ্ধে আসিবার সময় সম্রাট্‌ শাজাহান, যুদ্ধ না হয়, এরূপ চেষ্টা করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। সুজার হানি করা তাঁহার ইচ্ছা নহে। সম্রাটের এই কথা অনুসারে আমি সন্ধিস্থাপনের কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম সুজাও একপ্রকার সম্মত হইয়াছিলেন ; কিন্তু সুলাইমান যুবা পুরুষ আপন বিক্রম দেখাইবার জন্য অধীর হইয়া সহসা গঙ্গাপার হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এরূপ সময় একজন প্রহরী আসিয়া বলিল, "মহারাজ, সেনানী গজপতিসিংহ একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।" রাজা আসিতে আজ্ঞা দিলেন।

ক্ষণেক পর গজপতিসিংহ আসিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! বঙ্গদেশের একজন হিন্দু বন্দী হইয়াছে, সে আহত। তাহার নিকট হইতে বঙ্গদেশীয় অনেক সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।"

রাজা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপাততঃ আমার শিবিরে থাকিতে দাও।"

নরেন্দ্রনাথকে অচেতন অবস্থায় শিবিরে লইয়া যাওয়া হইল।

পরে জয়সিংহ গজপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"গজপতি, অদ্য তুমি যুদ্ধে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছ, সেজন্য তোমাকে ও তোমার প্রভু যশোবন্ত সিংহকে আমি ধন্যবাদ দিতেছি। এক্ষণে কি কথা বলিবার জন্য যশোবন্ত তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, নিবেদন কর।"

উভয়ে গুপ্ত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

॥ এগার ॥

তাহার পর কয়েকদিন নরেন্দ্রনাথ জ্বরে অচেতন অবস্থায় থাকিলেন। মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞা হইত, বোধ হইত যেন, তরীতে অতি দ্রুতবেগে গঙ্গার উপর দিয়া যাইতেছেন। পুনরায় কি দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন? বোধ হইত যেন এক অল্পবয়স্কা রমণী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। আবার কি হেমলতাকে ফিরিয়া পাইলেন? রোগীর চক্ষে জল আসিল।

কয়েকদিন এইরূপে অতিবাহিত হইল। রোগের ক্রমশঃ উপশম হইল। যখন সম্পূর্ণ চৈতন্য হইল, দেখিলেন, এক অপূর্ব ঘরে একটি দীপ জ্বলিতেছে। তিনি একটি শয্যায় শুইয়া রহিয়াছেন। এরূপ সুরম্য ঘর তিনি কখনো দেখেন নাই। সমস্ত ঘর সুন্দর শ্বেতপ্রস্তর দ্বারা নির্মিত। রৌপ্যের শামাদানে দীপ জ্বলিতেছে ও সমস্ত গৃহ সুগন্ধে আমোদিত করিতেছে। তাঁহার পালঙ্ক দ্বিরদরদখচিত, সুবর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা বিভূষিত। সম্মুখে একটি রৌপ্য-আধারের উপর এক রৌপ্য-পাত্রে জল রহিয়াছে, নীচে শয্যা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটি বিচিত্র গালিচার উপর এক যবনকন্যা ও এক খোজা বসিয়া অতি মৃদুস্বরে কথোপকথন

করিতেছে। যবনকন্যা যুবতী, তনুঙ্গী এবং সুন্দরী। মুখে সৌন্দর্য ঝল্‌মল্‌ করিতেছে, নয়ন হইতে সৌন্দর্য বিকীর্ণ হইতেছে, ললিত বাহুলতা ও কমনীয় দেহলতায় সৌন্দর্য প্রবাহিত হইতেছে। হেমলতার অবয়ব নরেন্দ্রের হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল, কিন্তু এরূপ উজ্জ্বল সৌন্দর্য নরেন্দ্র কোথাও দেখেন নাই, এরূপ স্বর্গীয় পরীর ন্যায় অবয়ব কখনও দেখেন নাই। যবনকন্যার দৃষ্টি ও অঙ্গভঙ্গীতে যেন তেজ ও দর্পের পরিচয় দিতেছে। যবনকন্যা এক একবার পীড়িত হিন্দুর দিকে চাহিতেছে, এক একবার বিষণ্ণভাবে ভূমির দিকে চাহিতেছে, আবার মৃদুস্বরে খোজার সহিত কথা কহিতেছে। খোজা কৃষ্ণবর্ণ ও বলবান্। তাহাদের কি কথা হইতেছিল, নরেন্দ্রনাথ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কেবল দুই একটা কথা শুনিতে পাইলেন।

যবনকন্যা বলিতেছিল,—"মসরুর, কেন এ হিন্দুর ও আমার সর্বনাশ করিবে? নির্দোষী নিরাশ্রয় ব্যক্তির জীবননাশে কি তোমাদের আমোদ?"

মসরুর। জেলেখা, তবে তুমি কাফেরকে এ স্থলে আনিলে কেন?

জেলেখা। সে আমার দোষ, ইহার কি দোষ? ইনি ত নির্দোষী।

মসরুর। কেন, এত মায়া কিসের জন্য? এ কাফের কি তোমার আসেক?

জেলেখা যোদ্ধৃকন্যা, সহসা তাহার বদনে পৈতৃক ক্রোধ ও তেজের আবির্ভাব হইল, রক্তোচ্ছ্বাসে মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। সক্রোধে বলিল,—"মসরুর! যদি তুমি স্ত্রীলোক হইতে, তাহা হইলে, মায়ার কাতরতা বুঝিতে, যদি পুরুষ হইতে, তথাপি হৃদয়ে দয়া থাকিত। তোমার পুরুষত্বের সহিত দয়া অন্তর্ধান হইয়াছে, এক্ষণে তোমার হৃদয় এই প্রস্তর শাণের অপেক্ষা কঠিন ও দুর্ভেদ্য।"

মসরুর হাসিয়া বলিল—"ঐ দেখ, কাফের উঠিয়াছে। আমি চলিলাম।" মসরুর বাহিরে চলিয়া যাইল।

জেলেখাও উঠিল, শয্যার দিকে আসিবার জন্যই উঠিল, কিন্তু ক্ষণেক স্থির হইয়া ভূমির দিকে স্থির-নয়নে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণেক পর জেলেখা ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের নিকট আসিয়া ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিল। ক্ষত প্রায় আরাম হইয়াছে, জ্বরও গিয়াছে, কেবল শরীর দুর্বল। নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া একদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। জেলেখার মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল, শরীরের রক্ত বেগে ললাট, চক্ষু ও গণ্ডস্থল আরক্ত করিল।

পূর্বেও এই গৃহ ও শয্যা দেখিয়া নরেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। কোথায় আসিয়াছেন, কে তাঁহাকে আনিল, কে সেবা করিতেছে? জেলেখা ও মসরুর কথা শুনিয়া ভীত হইয়াছিলেন, এখন জেলেখার আচরণ দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি কোথায় আছি,—এই কি বঙ্গদেশে,—আপনি কে,—আপনার নাম কি?"

নিস্তব্ধ নিশাযোগে সহসা বজ্রধ্বনি হইলে লোকে যেরূপ চমকিত হয়, জেলেখা সহসা নরেন্দ্রের এই প্রথম কথা শুনিয়া সেইরূপ চমকিত হইল; কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম ওষ্ঠদ্বয়ে অঙ্গুলিস্থাপন করিল।

নরেন্দ্র আবার বলিলেন,—"আমি অসহায় ও নিরাশ্রয়। আমি কোথায় আছি, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।"

জেলেখা আবার ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া সহসা মুখ ফিরাইল। নরেন্দ্রনাথের বোধ হইল, যেন, তিনি জেলেখার উজ্জ্বল চক্ষুতে জল দেখিতে পাইলেন; কিছু বুঝিতে পারিলেন না, চিন্তা করিতে করিতে আবার নিদ্রিত হইলেন।

॥ বার ॥

কয়েক দিবসের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ বিশেষ আরোগ্যলাভ করিলেন। কিন্তু শারীরিক আরোগ্যলাভ হইলে কি হইবে, অন্তঃকরণ চিন্তায় ক্লিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার সেই ঘরে কেবল মসরুর বা জেলেখা ভিন্ন কেহ আইসে না, কেহই কথা কহে না, মসরুরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাসিয়া চলিয়া যায়, জেলেখা ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলিস্থাপন করে, অথচ স্পষ্ট বোধ হয়, জেলেখা তাঁহার দুঃখে দুঃখিনী, তাঁহার বিপদে বিপদাপন্না। নরেন্দ্রনাথ ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি কি বঙ্গদেশে আসিয়াছেন? সুলতান সুজা নরেন্দ্রনাথকে ভালবাসিতেন, সুলতানই কি স্বয়ং আজ্ঞা দিয়া নরেন্দ্রের পীড়ার সময় রাজমহলে আনাইয়াছেন। সম্ভব বটে, রাজ-অট্টালিকা না হইলে এরূপ বহুমূল্য দ্রব্য কোথায় সম্ভবে? কিন্তু সুজা কাশীর যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথ মৃতপ্রায় হইয়া শত্রুহস্তে পড়িয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অল্প-অল্প স্মরণ ছিল। শত্রুরা কি অবশেষে তাঁহাকে জল্লাদহস্তে দিবার জন্য এইরূপ শুশ্রূষা করিতেছিলেন? নরেন্দ্র কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

রজনী দ্বিপ্রহর, নরেন্দ্রনাথ একখানি দ্বিরদরদখচিত আসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে এক দীপ জ্বলিতেছে। নরেন্দ্র হস্তে গণ্ডস্থাপন করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন।

যখন চিন্তা-রজ্জু ছিন্ন হইল, একবার বদনমণ্ডল উঠাইয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন। কি দেখিলেন?—জেলেখা নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন? জেলেখার মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠদ্বয় পাণ্ডুবর্ণ কেশপাশ আলুলায়িত, বদন বিষণ্ণ, নয়নদ্বয় জলে ছল্‌ছল্‌ করিতেছে। নরেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রমণী! আপনি কে জানি না, আপনার কি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলুন।"

জেলেখা উত্তর করিল না, ধীরে ধীরে একবিন্দু চক্ষের জল মোচন করিল।

নরেন্দ্র আবার বলিলেন,—"আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, কোন বিপদ বা ভয় সন্নিকট। প্রকাশ করিয়া বলুন, যদি উদ্ধারের উপায় থাকে, আমি চেষ্টা করিব।"

জেলেখা তথাপি নীরব; নীরবে অশ্রুমোচন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। নিশাযোগে এই সহসা সাক্ষাতের অর্থ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার বোধ হইল যেন. কোন ঘোর সঙ্কট সন্নিকট। তিনি হস্তে গণ্ডস্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, অন্যমনস্ক হইয়া নানা বিপদের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সহসা গৃহের দীপ নির্বাণ হইল, সেই ঘোর অন্ধকারে একজন খোজা আসিয়া নরেন্দ্রকে তাহার সঙ্গে যাইতে ইঙ্গিত করিল। নরেন্দ্র সভয়ে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। উভয়ে নিস্তব্ধে কত ঘর, কত প্রাঙ্গণ পার হইয়া গেলেন, তাহা বলা যায় না। নরেন্দ্র রাজমহলের প্রাসাদ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ প্রাসাদ কখনও দেখেন নাই। কোথাও শ্বেতপ্রস্তর বিনির্মিত ঘরের ভিতর সুন্দর গন্ধদীপ জ্বলিতেছে, শ্বেতপ্রস্তর স্তম্ভাকারে উন্নত ছাদ ধরিয়া রহিয়াছে, স্তম্ভে, ছাদে ও চারিদিকে বহুমূল্য প্রস্তরের ও সুবর্ণ-রৌপ্যের যে কারুকার্য, তাহা বর্ণনা করা যায় না। কোথাও প্রাঙ্গণে ঈষৎ চন্দ্রালোকে সুন্দর ফোয়ারার জল খেলিতেছে, চারিদিকে সুন্দর বাগান, সুন্দর পুষ্পলতা, তাহার উপর দিয়া নৈশ সমীরণ নিস্তব্ধে বহিয়া যাইতেছে। কোথাও বা উদ্যান-বৃক্ষতলে আসীন হইয়া দুই একজন উজ্জ্বলবর্ণা উজ্জ্বলবেশধারিণী রমণী বীণা বাজাইতেছে অথবা নিদ্রার বশীভূত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। বাহিরে খোজাগণ নিঃশব্দে পদচারণ করিতেছে আর রহিয়া রহিয়া মৃদুস্বরে নৈশ বায়ু সেই ইন্দ্রপুরীর উপর বহিয়া যাইতেছে। নরেন্দ্র আপন বিপদকথা ভুলিয়া গেলেন, এই সুন্দর প্রাসাদ, সুন্দর ঘর ও প্রাঙ্গণ,

সুন্দর উদ্যান ও এই অপূর্ব পরিবেশধারিণী রমণীদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি কোথায়? এ কোন্ স্থান?

কতক্ষণ পরে তিনি একটি উন্নত সুবর্ণ-খচিত কবাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সহসা সেই কবাট ভিতর হইতে খুলিয়া গেল। নরেন্দ্র একটি উন্নত আলোকপূর্ণ ঘরে প্রবেশ করিলেন। সহসা অন্ধকার হইতে উজ্জল আলোকে আনীত হওয়ায় কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া হস্তদ্বারা নয়ন আবৃত করিলেন, অমনি শত শত নারী-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত হাস্যধ্বনিতে সে উন্নত প্রাসাদ ধ্বনিত হইল।

নরেন্দ্র জীবনে কখনও এরূপ বিস্মিত হয়েন নাই। কোথায় আসিলেন? এ কি প্রকৃত ঘটনা, না স্বপ্ন? এ কি পার্থিব ঘটনা, না ইন্দ্রজাল? নরেন্দ্র পুনরায় চক্ষু উন্মীলন করিলেন, পুনরায় উজ্জল আলোকচ্ছটায় তাঁহার নয়ন ঝলসিত হইল। আবার হস্তদ্বারা নয়ন আবৃত করিলেন। পুনরায় শত নারী-কণ্ঠধ্বনিতে প্রাসাদ শব্দিত হইল।

ক্ষণেক পরে যখন নরেন্দ্র চাহিতে সক্ষম হইলেন, তখন যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময় দশগুণ বর্ধিত হইল। দেখিলেন, মর্মর-প্রস্তর বিনির্মিত একটি উচ্চ প্রাসাদের মধ্যে তিনি আনীত হইয়াছেন! সারি সারি প্রস্তরস্তম্ভ উচ্চ ছাদ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সে ছাদে ও সে স্তম্ভে যেরূপ বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরে, কারুকার্য দেখিলেন, সেরূপ তিনি জগতে কুত্রাপি দেখেন নাই। স্তম্ভ হইতে স্তম্ভান্তরে সুগন্ধ পুষ্পমালা লম্বিত রহিয়াছে, নীচে স্তবকে স্তবকে পুষ্পরাশি সজ্জিত রহিয়াছে, শত-নারীকণ্ঠ হইতে পুষ্পমালা দোদুল্যমান হইয়া সুগন্ধে ঘর আমোদিত করিতেছে। ছাদ হইতে, স্তম্ভ হইতে, পুষ্প ও পত্ররাশির মধ্য হইতে সহস্র গন্ধদীপ নয়ন ঝলসিত করিতেছে ও সেই সুন্দর উন্নত প্রাসাদ আলোকময় ও গন্ধে পরিপূর্ণ করিতেছে। রেখাকারে শত রমণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই রেখার মধ্যস্থানে দীপালোক-প্রতিঘাতী রত্নরাজিবিনির্মিত উচ্চ সিংহাসনে তাহাদিগের

রাজ্ঞী উপবেশন করিয়া আছেন। এ স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল? নরেন্দ্র আলফ্ লায়লায় পড়িয়াছিলেন যে, এবনহাসেন নামক একজন দরিদ্র ব্যক্তি একদিন নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া সহসা দেখিলেন যেন তিনি বোগদাদের খালিফ হইয়াছেন! নরেন্দ্রের স্বপ্ন তদপেক্ষাও বিস্ময়কর, তিনি যেন সহসা স্বর্গোদ্যানে আপনাকে অপ্সরাবেষ্টিত দেখিলেন।

নরেন্দ্র সেই অপ্সরা বা নারীরেখার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহারা নিঃশব্দে রেখাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সকলেই বক্ষের উপর দুই হস্ত স্থাপন করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, দেখিলে জীবনশূন্য পুত্তলির ন্যায় বোধ হয়। তাহাদের কেশপাশ হইতে মণিমুক্তা দীপালোক প্রতিহত করিতেছে, উজ্জ্বল বহুমূল্য বসন সেই আলোকে অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতেছে। তাহারা সকলেই যেন রাজ্ঞীর আদেশ-সাপেক্ষ হইয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

সেই রাজ্ঞীর দিকে যখন চাহিলেন, নরেন্দ্র তখন শতগুণ বিস্মিত হইলেন। যৌবন অতীত হইয়াছে, কিন্তু যৌবনের উজ্জ্বল সৌন্দর্য ও উন্মত্ততা এখনও বিলীন হয় নাই, বোধ হয় যেন প্রথম যৌবনের বেগ ও লালসা বয়সে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজ্ঞীর শরীর উন্নত, ললাট প্রশস্ত, ওষ্ঠ ও সমস্ত বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ, কৃষ্ণ কেশপাশ হইতে একটিমাত্র বহুমূল্য হীরকখণ্ড আলোকে ধক্‌ধক্ করিতেছে। নয়নদ্বয় তদপেক্ষা অধিক জ্যোতির সহিত উজ্জ্বল, মল্‌মলের অবগুণ্ঠনে সে উজ্জ্বলতা গোপন করিতে অক্ষম। দেখিলেই বোধ হয়, নারী হউন বা অপ্সরা হউন, ইনি কোন অসাধারণ মহিলা, জগৎ বা স্বর্গপুরী শাসন করিবার জন্যই ধরাতে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

কিন্তু নরেন্দ্রের এ সমস্ত দেখিবার অবসর ছিল না। সহসা যেন স্বর্গীয় বাদ্যযন্ত্র হইতে কোন স্বর্গীয় তান উত্থিত হইতে লাগিল। তাহার সহিত সেই শত অপ্সরার কণ্ঠধ্বনি মিশ্রিত হইতে লাগিল। সেরূপ অপরূপ গীত নরেন্দ্র কখনও শুনেন নাই, তাঁহার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইল, তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই গীত শ্রবণ করিতে

লাগিলেন। সেই গীত ক্রমে উচ্চতর হইয়া সেই উন্নত প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া, নৈশ গগনে বিস্তার পাইতে লাগিল, বোধ হইল যেন, নৈশ গগনবিহারী অদৃষ্ট জীবগণ সেই গীতের সহিত যোগ দিয়া শতগুণ বর্ধিত করিতে লাগিল। ক্রমে আবার মন্দীভূত হইয়া সে গীত ধীরে ধীরে লীন হইয়া গেল, আবার প্রাসাদ নিস্তব্ধ—শব্দশূন্য। এইরূপ একবার, দুইবার, তিনবার গীতধ্বনি শ্রুত হইল। সেই গীতধ্বনি ক্রমে লীন হইয়া গেল।

তখন রাজ্ঞী সজোরে পদাঘাত করায় সেই প্রাসাদের একদিকের একটি রক্তবর্ণ যবনিকা পতিত হইল। নরেন্দ্র সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার অপর পার্শ্বে চারিজন কুঠারধারী কৃষ্ণবর্ণ খোজা রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রাজ্ঞী পুনরায় পদাঘাত করায় তাহাদের মধ্যে প্রধান একজন রাজ্ঞীর সিংহাসনপার্শ্বে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল। নরেন্দ্র দেখিলেন, সে মসরুর। নরেন্দ্রের ধমনীতে শোণিত শুষ্ক হইয়া গেল।

মসরুর রাজ্ঞীর সহিত অনেকক্ষণ অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিল, কি বলিতেছিল, নরেন্দ্র তাহা শুনিতে পাইলেন না; কিন্তু কথা কহিতে কহিতে মধ্যে মধ্যে সে নরেন্দ্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া, নয়ন আরক্ত করিয়া, যেন কি উত্তেজনা করিতে লাগিল। মসরুর কি বলিতেছিল, নরেন্দ্র তাহা জানিতে পারিলেন না; কিন্তু তাহার আকৃতি ও অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। নরেন্দ্রকে এই অপরিচিত দেশে জল্লাদ হস্তে প্রাণ দিতে হইবে, তাঁহার প্রতীতি হইল।

রাজ্ঞী পুনরায় পদাঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রাসাদের অন্য পার্শ্বে একটি হরিদ্বর্ণ যবনিকা পতিত হইল। তাহার অপর পার্শ্বে চারিজন পরিচারিকা হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দ্বিতীয়বার পদাঘাত করায় সেই পরিচারিকাগণ একজন বন্দীকে রাজ্ঞীর নিকট ধরিয়া আনিল। নরেন্দ্র সবিস্ময়ে দেখিলেন সে বন্দী জেলেখা।

জেলেখা কি বলিল, নরেন্দ্র তাহা শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু তাহার আকার ও অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল, সে রাজ্ঞীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে, অশ্রুত্যাগ করিয়া রাজ্ঞীর পদে লুণ্ঠিত হইতেছে।

রাজ্ঞী বার বার নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। নরেন্দ্র স্বভাবতঃ গৌরবর্ণ, তাঁহার নয়ন জ্যোতিঃ-পরিপূর্ণ, ললাট উন্নত, বদনমণ্ডল উগ্র ও তেজোব্যঞ্জক। সাহসী, অল্পবয়স্ক সুন্দর যুবার উন্নত ললাট ও প্রশস্ত মুখমণ্ডলের দিকে রাজ্ঞী বার বার নয়ন-ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রের দিকে অনেকক্ষণ চাহিতে চাহিতে রাজ্ঞী নরেন্দ্রের অঙ্গুলিতে একটি অঙ্গুরীয় দেখিতে পাইলেন, হতভাগিনী জেলেখা নরেন্দ্রের পীড়ার সময়ে একদিন লীলাক্রমে সে অঙ্গুরীয়টি পরাইয়া দিয়াছিল, সেই অবধি তাহা নরেন্দ্রের হাতে ছিল। অঙ্গুরীয় রাজ্ঞীর পরিচারিকাগণ চিনিল, রাজ্ঞী স্বয়ং চিনিলেন। তখন ক্রোধে রাজ্ঞীর সুন্দর ললাট রক্তবর্ণ হইল, নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইল।

বিচার শেষ হইল। নির্দয়হৃদয়া রাজ্ঞী আদেশ দিলেন, "জেলেখা অপরাধিনী, পাপীয়সীকে শূলে দাও। কাফেরকে লইয়া যাও, হস্তিপদে দলিত করিয়া কাফেরকে হনন কর।"

একেবারে দীপাবলী নির্বাণ হইল। নিঃশব্দে অন্ধকারে খোজাগণ রজ্জুদ্বারা নরেন্দ্রকে বন্ধন করিতে লাগিল।

অন্ধকারে কে নরেন্দ্রের মুখের নিকট একটি পাত্র ধারণ করিল। নরেন্দ্র বিস্ময় ও উদ্বেগে তৃষ্ণার্ত হইয়াছিলেন, সেই পাত্র হইতে পানীয় পান করিলেন, অচিরাৎ অচেতন হইয়া পড়িলেন। তাহার পর কি হইল, তিনি জানিলেন না, কেবল বোধ হইল যেন সেই অন্ধকারে কে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে সেই অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিল, আর কে যেন সেই অন্ধকারে রোদন করিতেছিল। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, সে অভাগিনী জেলেখা।

নরেন্দ্রনাথ যখন জাগরিত হইলেন, তখন দেখিলেন, সূর্যোদয় হইয়াছে, সূর্যের রশ্মিতে তিনি একটি প্রশস্ত বাজারের মধ্যে একটি

পর্ণকুটীরের ধারে শুইয়া রহিয়াছেন। সূর্যের নবজাত রশ্মি তাঁহার মুখে পতিত হইয়াছে ও পথ, ঘাট, অট্টালিকা, দোকান, বাজার, বস্তী আলোকময় করিয়াছে। এ কোন্ শহর? এ কি বঙ্গদেশের রাজধানী রাজমহল? সুলতান সুজা কি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বারাণসী হইতে এই স্থানে আনিয়াছেন? গত নিশায় কি তিনি এই ভূমিশয্যায় শুইয়া প্রাসাদ ও পরীর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন?

॥ তের ॥

নরেন্দ্রের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সে স্থানটি তিনি পূর্বে কখনও দেখেন নাই। সেই স্থান একটি প্রকাণ্ড সরাইয়ের মত বোধ হইল। মধ্যস্থানে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, তাহার চারিপার্শে দ্বিতল হর্ম্যশ্রেণী, প্রত্যেক প্রকোষ্ঠেই দুই একটি করিয়া লোক আছে। সে সমস্ত লোক অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত পারস্য, উসবেক, পাঠান বা হিন্দু বাণিজ্য-ব্যবসায়ী লোক, প্রথমে নগরে আসিয়া এই সরাইয়ে বাসা করিয়া আছে। সকল লোক সরাইয়ে আসিলে নিশায় দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে প্রাতঃকালে পুনরায় সরাইয়ের বহির্দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, লোকে গমনাগমন করিতে লাগিল।

এক বৃদ্ধ পারস্যদেশীয় সেখ একটি প্রকোষ্ঠে বসিয়া তামাক খাইতেছিল। নরেন্দ্র যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেখজী, এটি কোন স্থান? আমি এখানে নূতন আসিয়াছি, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না।" সেখজী বলিলেন, "বৎস, আমিও বাণিজ্যকর্মে এই শহরে কল্য আসিয়াছি, শহরের বিশেষ কিছু জানি না।"

নরেন্দ্র। আপনি আমার অপেক্ষা অধিক জানেন। এই স্থানের কথা আমাকে কিঞ্চিৎ বলুন।

সেখজী। আমি যথার্থই বলিতেছি, এ শহরের কিছুই জানি না। তবে শুনিলাম, এই স্থানটি বেগম সাহেবার সরাই। সম্রাটের জ্যেষ্ঠা কন্যা বাদ্‌শা-বেগম শহরে নূতন আগন্তুকের থাকিবার সুবিধার

জন্য এই উৎকৃষ্ট সরাই নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আমি সমরকন্দ ও বোখারা দেখিয়াছি, সিরাজ ও ইস্পাহান দেখিয়াছি, কিন্তু এমন সুন্দর শহর দেখি নাই।

নরেন্দ্র। এ শহরের নাম কি? বাদ্‌শা বেগমই বা কে?

বৃদ্ধ বণিক্ অনেকক্ষণ স্থির-দৃষ্টিতে যুবকের দিকে চাহিয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—"এ কাফের দেখিতেছি জ্ঞানশূন্য, পাগলটাকে তাড়াইয়া দাও, পাগলামী চড়িলেই এইক্ষণেই কি করিয়া বসিবে।"

নরেন্দ্র গতিক মন্দ দেখিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন। পরে তিনি দেখিলেন একজন পাঠান-স্ত্রী কতকগুলি ফলমূল লইয়া বিক্রয়ার্থ ধনী বণিক্‌দিগের নিকট যাইতেছে। নরেন্দ্র তাহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিবি, এ শহরের নাম কি, এ স্থানকেই বা লোকে কি বলে?" বৃদ্ধা বিস্মিতা হইয়া ক্ষণেক নরেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া পরে উত্তর করিল,—"কাফের, আমার সে বয়স নাই, উপহাস করিতে হয়, অন্য স্থানে যাও, এ খুবসুরত মুখ দেখিলে অনেক খঞ্জনীও ভুলিয়া যাইবে।"

নরেন্দ্রনাথ অপ্রতিভ হইলেন, দেখিলেন, একজন রাজপুত সৈনিক-পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, একজন ভৃত্য তাঁহার অশ্বের সেবা করিতেছে, সৈনিক সসজ্জ হইয়া ভৃত্যকে শীঘ্র কার্য সমাধা করিতে বলিতেছেন। নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি এই স্থানে নূতন আসিয়াছি, এ স্থানটির নাম কি, জানি না। আপনি বোধ হয়, অনেকদিন এ স্থানে আছেন, আমাকে এ নগরের কথা সব কিছু বলিতে পারেন?"

রাজপুত অনেকক্ষণ নরেন্দ্রের দিকে দেখিয়া উত্তর করিলেন, —"বালক, তোমার মুখ আমি পূর্বে দেখিয়াছি, তুমি বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছ, না? হাঁ, স্মরণ হইয়াছে, তুমি আমাকে ইহার মধ্যে বিস্মৃত হইয়াছ?"

নরেন্দ্র তখন রাজপুতকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—

"না, বিস্মৃত হই নাই, গজপতি, তুমি কাশীর যুদ্ধের পর আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, জীবন থাকিতে আমি তোমাকে বিস্মৃত হইতে পারিব না।"

দুইজনে অনেকক্ষণ আলাপ-পরিচয় হইতে লাগিল। বিস্মিত হইয়া নরেন্দ্র জানিলেন যে, নগর হিন্দুস্থানের রাজধানী প্রসিদ্ধ দিল্লী নগরী ঃ কথায় কথায় গজপতি প্রকাশ করিলেন,—"আমি মহারাজ জয়সিংহের নিকট হইতে কতিপয় পত্রাদি লইয়া মহারাজ যশোবন্ত-সিংহের নিকট যাইতেছি। তিনি আপাততঃ উজ্জয়িনীতে আওরংজীবের সহিত যুদ্ধার্থে গিয়াছেন, যুদ্ধ না হইতে হইতে আমি তথায় পৌঁছিতে পারিলেই মঙ্গল! তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে আমার সঙ্গে আইস, আমি মহারাজকে বলিয়া তোমাকে অশ্বারোহীর কার্যে নিযুক্ত করিয়া দিব।" নরেন্দ্র সে দেশে বন্ধুহীন ও অর্থহীন, ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তৎপরে দুইজনে দিল্লী নগরী ভ্রমণে বাহির হইলেন।

মহাভারতে বিবৃত ইন্দ্রপ্রস্থ নগর যেস্থানে ছিল, ভারতবর্ষের শেষ হিন্দু-সম্রাট্ পৃথুরায়ের রাজধানী দিল্লী নগরী যেস্থানে ছিল, এই আখ্যায়িকা-বিবৃত সময়ের কয়েক বৎসর পূর্বে সম্রাট্ শাজাহান সেইস্থানে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া ও সুন্দর প্রাসাদ ও দুর্গ নির্মাণ করিয়া নগরের শাজাহানাবাদ নাম দেন। কিন্তু নগরের সে নাম কেহ জানে না। অদ্যাপি শাজাহানের নগর নূতন দিল্লী নামে বিখ্যাত। পৃথুরায়ের সময়ের হিন্দু নাম অদ্যাপি পরিবর্তিত হয় নাই।

দিল্লী একদিকে যমুনা নদী ও অন্য তিনদিকে অর্ধগোলাকৃতি-রূপে প্রাচীর দিয়া বেষ্টিত। সে প্রাচীর প্রশস্ত ও তাহার উপর দিয়া যাতায়াতের একটি পথ ছিল। যমুনা ও এই প্রাচীরের মধ্যে দিল্লী নগরী সন্নিবেশিত, কিন্তু প্রাচীরের বাহিরেও তিন-চারিটি বৃহৎ বৃহৎ পল্লী ও ধনাঢ্য ওমরাহ ও হিন্দুরাজগণের অট্টালিকা ও বাগান অনেকদূর অবধি দেখা যাইত। দিল্লীর ভিতরে যমুনার

অনতিদূরে প্রস্তর-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত দুর্গ আছে, তাহার ভিতর সম্রাটের প্রাসাদ ও জগতে অতুল্য মর্মর-নির্মিত হর্ম্যাবলী।

গজপতিও নরেন্দ্র দিল্লীর একটি প্রধান পথ দিয়া দুর্গাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। সমস্ত দিল্লীই প্রায় সৈনিকের বাস, সে নগরীতে পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র সৈন্য বাস করিত। সৈনিকগণের স্ত্রী, পরিবার ও বহুসংখ্যক ভৃত্য দিল্লী-নগরীর মৃত্তিকা ও পর্ণকুটীরে বাস করিত, সুতরাং দিল্লী এইরূপ পর্ণকুটীরেই পরিপূর্ণ। যেদিকে দেখা যায়, এইরূপ কুটিরশ্রেণীই অধিকাংশ দেখা যায়। খাদ্যদ্রব্য, ও বস্ত্রাদি বিক্রয়ার্থ যে দোকান ছিল, তাহাও অধিকাংশ পর্ণকুটীর সর্বদাই অগ্নি লাগিত ও বৎসরে প্রায় বহু সহস্র পর্ণকুটীর একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইত। নরেন্দ্র দুইধারে এইরূপ কুটীর দেখিতে দেখিতে চলিলেন। দোকানী-পশারী নানারূপ দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে; পথ লোকারণ্য; অধিকাংশই অতি সামান্য লোক, অতি সামান্য বেশে নিজ নিজ কর্মে যাইতেছে। দিল্লীতে এক্ষণে যেরূপ মধ্যশ্রেণী ব্যবসায়ী ও অন্যান্য লোক ইষ্টকালয় নির্মাণ করিয়া নগর পরিপূর্ণ ও সুশোভিত করিয়াছে, দুইশত বৎসর পূর্বে তাহা ছিল না। তখন কেবল মহল্লোক বা ইতর লোক ছিল প্রাসাদ বা পর্ণকুটীরে।

যাইতে যাইতে নরেন্দ্র একটি বড় রাজপথে গিয়া পড়িলেন। সে পথে অনেকগুলি প্রশস্ত ও বড় বড় অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। মনসবদার, কাজী, বণিক্, ওমরাহ, রাজা প্রভৃতি মহল্লোকের হর্ম্যশ্রেণীতে পথ সুন্দর দেখাইতেছে। নরেন্দ্র এরূপ সুন্দর অট্টালিকাশ্রেণী কোথাও দেখেন নাই, প্রাসাদসমূহের পার্শ্ব দিয়া যাইতে যাইতে গজপতির সহি· তিনি কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক যাইতে যাইতে উভয়ে প্রসিদ্ধ জুম্মা-মস্‌জিদ দেখিতে পাইলেন। ভারতবর্ষে সেরূপ মস্‌জিদ আর একটিও ছিল না, বোধ হয় জগতে সেরূপ নাই। নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সম্মুখে ঐ বৃহৎ মস্‌জিদটির নাম কি?"

গজপতি। ওটি জুম্মা মস্‌জিদ। শুনিয়াছি, একটি পর্বতের উপরিভাগে সমতল করিয়া তাহার উপর ঐ মস্‌জিদ নির্মিত হইয়াছে। উহার আরক্তবর্ণে নয়ন ঝল্‌সাইয়া যাইতেছে, তাহার উপর শ্বেত-প্রস্তরের তিনটি গম্বুজ উঠিয়াছে। বাদশাহ যখন দিল্লীতে থাকেন স্বয়ং ঐ মস্‌জিদে প্রতি শুক্রবার যান, সে সমারোহ তুমি একদিন দেখিলে কখনও ভুলিতে পারিবে না। দুর্গ হইতে মস্‌জিদ পর্যন্ত চারি-পাঁচ শত সিপাহী সারি দিয়া দাঁড়ায়। তাহাদের বন্দুকের ওপর হইতে সুন্দর রক্তবর্ণ পতাকা উড়িতে থাকে। পাঁচ ছয় জন অশ্বারোহী পথ পরিষ্কার করিতে করিতে আগে যায়, পরে বাদশাহ হস্তীর উপর জাজ্জ্বল্যমান সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যান, তাহার পর ওমরাহ ও মন্‌সবদারগণ অপরূপ সজ্জা করিয়া মস্‌জিদে গমন করে। কিন্তু আর এ স্থানে দাঁড়াইয়া কি হইবে? চল, আমরা দুর্গের ভিতর যাইয়া রাজবাটী দেখি।

দূর হইতেই রক্তবর্ণ উন্নত দুর্গ-প্রাচীরের অপরূপ সৌন্দর্য দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ চমৎকৃত হইলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষে যে দেশের যে লোক আসিযাছেন, তিনি দিল্লীর দুর্গ ও রাজবাটীর শ্বেত-প্রস্তরনির্মিত মস্‌জিদ, প্রাসাদ ও হর্ম্যাবলীকে জগতের মধ্যে অতুল্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। দুর্গ-প্রবেশের স্থানে একটি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন, তার মধ্যে একজন হিন্দুরাজার শিবিরশ্রেণী রহিয়াছে, রাজা দুর্গের দ্বাররক্ষা করিতেছেন, অশ্বারোহী ও ওমরাহগণ সর্বদাই এদিক ওদিক যাতায়াত করিতেছেন এবং দুর্গের ভিতর হইতে সিপাহিগণ বাহিরে আসিতেছে, আবার ভিতরে যাইতেছে। বিদেশীয় বণিক্‌গণ দুর্গদ্বারে সমবেত হইতেছে এবং সহস্র সহস্র ইতর লোকও নদীর স্রোতের ন্যায় এদিক ওদিক ধাবিত হইতেছে।

দ্বারদেশে দুইটি প্রস্তরনির্মিত হস্তীর আকৃতি, তাহার উপর দুইটি মনুষ্যের প্রতিমূর্তি। নরেন্দ্র উৎসুক হইয়া, 'এ কাহার প্রতিমূর্তি' জিজ্ঞাসা করিলেন। গজপতি বলিলেন, "আপনি হিন্দু, আপনি জানেন না? ইঁহারা দুইজন রাজপুত বীরপুরুষ। চিতোরের

জয়মল্ল ও পত্ত, সম্রাট আকবরের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া সেই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে যখন আর পারিলেন না, অধীনতা স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হইয়া যুদ্ধে হত হয়েন। আমার পিতামহ তিলকসিংহ সেই যুদ্ধে জীবনদান করিয়াছিলেন, পিতা তেজসিংহের নিকট বাল্যকালে সে অপূর্ব কাহিনী শুনিতাম। পত্তের মাতা ও বনিতা বীররমণী ছিলেন, তাঁহারাও বীরত্ব প্রকাশ করিয়া হত হয়েন। তাঁহাদিগের কীর্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সম্রাট আকবর এই প্রতিমূর্তি এই স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। পরে সগর্বে গজপতি বলিলেন, "কিন্তু রাজপুত রাজাদিগের কীর্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য প্রতিমূর্তির আবশ্যক নাই, যতদিন বীরত্বের গৌরব থাকিবে, রাজপুত নাম কেহ বিস্মৃত হইবে না, রাজপুতানার প্রত্যেক পর্বতশিখরে রাজপুতের বীরনাম খোদিত আছে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক বেগবতী নদীতরঙ্গে রাজপুতের বীরনাম শব্দিত হইতেছে।"

প্রশস্ত পথ অতিবাহন করিয়া দুইজনে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পথের দুই ধারে অট্টালিকা, তাহার উপর রাজকর্মচারিগণ রাজকার্য করিতেছেন। দুর্গের দ্বারের বাহিরে যেরূপ হিন্দুরাজগণ দ্বাররক্ষা করিতেন, ভিতরে এই পথের উপর মনসবদার ও ওমরাহগণ সেইরূপ দ্বাররক্ষা করিতেন।

দুর্গের ভিতর উভয়ে বড় বড় কারখানা দেখিতে পাইলেন। রাজপরিবারের যে সমুদায় বিচিত্রদ্রব্য আবশ্যক হইত, ঐ স্থানে তাহা প্রস্তুত হইত। এক স্থানে রেশমকার্যের কারখানা, অন্য স্থান স্বর্ণকারদিগের, অপর স্থান চিত্রকরদিগের। ছুতার, দরজী, চর্ম-ব্যবসায়ী, বস্ত্রব্যবসায়ী প্রভৃতি সকল প্রকার লোকের কারখানা ছিল। দেশে যত উৎকৃষ্ট কারিগর ছিল, তাহারা প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কার্য করিত ও মাসিক বেতন পাইত।

সে সমস্ত কারখানা পশ্চাতে রাখিয়া উভয়ে ভিতরে যাইতে লাগিলেন। অনেক সমারোহের মধ্য দিয়া, অনেক বিস্ময়কর হর্ম্য

ও প্রাসাদের পার্শ্ব দিয়া যাইয়া অবশেষে জগদ্বিখ্যাত মর্মরপ্রাসাদ, "দেওয়ান খাস" দেখিতে পাইলেন; প্রাসাদের ছাদ সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত ও রৌদ্র-তাপে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। প্রাসাদের ভিতরে সুবর্ণ ও হীরকখচিত দিবালোকে-প্রতিঘাতী রত্ন-বিনিন্দিত রাজ-সিংহাসনের উপর সম্রাট্‌ শাজাহান উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার গম্ভীর ও প্রশান্ত মুখমণ্ডলে এখনও পীড়ার চিহ্ন অংকিত রহিয়াছে; তিনি এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেন নাই। দক্ষিণপার্শ্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার ললাট ও বদনমণ্ডল সুন্দর ও প্রশস্ত, কিন্তু মুখে দুর্দমনীয় দর্প ও অভিমান বিরাজ করিতেছে। বামদিকে পৌত্র সুলতান সালাইমান দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; বয়স পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইবে, অবয়ব ও আকৃতি সুন্দর ও উন্নত। পশ্চাতে খোঁজাগণ ময়ূরপুচ্ছ-বিনির্মিত চামর হেলাইতেছে। তালার চারিদিকে রৌপ্য-নির্মিত রেল আছে, রেলের বাহিরে রাজা, ওমরাহ, মন্‌সবদার, দূত, সেনাপতি ও ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান লোক উচিত বেশভূষায় ভূষিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমির দিকে চাহিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন। সম্মুখস্থ সমভূমি লোকে পরিপূর্ণ। কি ধনী, কি নির্ধন, কি উচ্চ, কি নীচ, সেস্থানে যাইয়া রাজাকে দর্শন করিবার সকলেরই অধিকার আছে। সেই অপূর্ব প্রাসাদে যথার্থই লিখিত রহিয়াছে,—"যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, তবে এই স্বর্গ, এই স্বর্গ—এই স্বর্গ।"

সম্রাটের সম্মুখে প্রথমে সুন্দর আরবদেশীয় অশ্ব প্রদর্শিত হইল। পরে বৃহৎকায় হস্তিশ্রেণী প্রদর্শিত হইল। হস্তিগণ কর উত্তোলন করিয়া বাদশাহকে "তস্‌লীম" করিয়া চলিয়া গেল। পরে হরিণ, বৃষ, মহিষ, গণ্ডার, ব্যাঘ্র প্রভৃতি সকল জন্তু ও তৎপরে নানারূপ পক্ষী একে একে প্রদর্শিত হইল। সম্রাটের বর্মধারী অশ্বারোহিগণ, তৎপরে বহু রণদর্শী কয়েক শত পদাতিক, তৎপরে অন্যান্য সেনাগণ একে একে সম্রাটের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল; তাহাদিগের পদভরে মেদিনী কম্পিত হইল।

প্রদর্শন সমাপ্ত হইলে পর বাদশাহ দরখাস্ত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কি নীচ, কি উচ্চ, সকলেই আসিয়া রাজাধিরাজ ভারতবর্ষের সম্রাটের নিকট আপন আপন দুঃখ জানাইতে লাগিল, সম্রাট্ দুই একটি আদেশ দিয়া সকলের দুঃখ মোচন করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ যে বিষয়ে যে কথা বলিলেন, তৎক্ষণাৎ সকল প্রাধান প্রাধান ওমরাহগণ "কেরামৎ" "কেরামৎ" বলিয়া ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

দুই ঘণ্টার মধ্যে রাজকার্য সমাধা হইয়া গেল, সম্রাট পুত্র ও কয়েকজন প্রধান প্রধান ওমরাহের সহিত "গোসলখানায়" গেলেন। গোসলখানা কেবল হস্তমুখপ্রক্ষালনের জন্য নির্মিত হয় নাই, তথায় প্রধান প্রধান অমাত্যদিগের সহিত রাজকার্যের গূঢ়মন্ত্রণাদি হইত।

নরেন্দ্র গোসলখানার পশ্চাতে উচ্চ প্রাচীর দেখিতে পাইলেন, তাহার ভিতরে অনেক হর্ম্য ও প্রাসাদ আছে। গজপতি কহিলেন,—"ঐ প্রাচীরের পশ্চাতে রাজবাটীর বেগমদিগের ভিন্ন ভিন্ন মহল আছে। শুনিয়াছি সে সমস্ত মহল অতিশয় চমৎকার, প্রত্যেক বেগমের মর্মর-প্রাসাদের চারিদিকে উদ্যান ও কুঞ্জবন, গ্রীষ্মকালে দিবায় থাকিবার জন্য মৃত্তিকার অভ্যন্তরে ঘর এবং নিশায় শয়নের জন্য প্রস্তর-নির্মিত উচ্চ উচ্চ ছাদ আছে। কিন্তু সম্রাট্ ভিন্ন অন্য পুরুষের নয়ন সে সৌন্দর্য কখনও দেখে নাই, পুরুষের পদচিহ্নে সে রম্যস্থান অঙ্কিত হয় নাই।

নরেন্দ্রনাথের পূর্বরাত্রির কথা সহসা স্মরণ হইল। তাঁহার বোধ হইল, ঐ প্রাচীরের পশ্চাতে বেগমদিগের প্রাসাদসমূহের সৌন্দর্য তাঁহার নয়ন দর্শন করিয়াছে, তাঁহার পদচিহ্নে সে রম্যস্থান অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু সে পূর্বরাত্রির বিস্ময়কর কথা তিনি গজপতির নিকট প্রকাশ করিলেন না, আপনিও ঠিক বুঝিতে পারিলেন না।

॥ চৌদ্দ ॥

দুইজনে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বহির্ভাগে বিস্তৃত প্রাঙ্গনে আসিয়া পড়িলেন, সেস্থান তখনও জনাকীর্ণ। বড় বড় লোক কেহ শিবিকায়, কেহ হস্তির উপর, কেহ অশ্বারোহী হইয়া এদিকে-ওদিকে যাতায়াত করিতেছে এবং শত শত ব্যবসায়ী লোক নানা অপরূপ ও বহুমূল্য দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে, তাহা ক্রয় করিতে বা দেখিতে সহস্র সহস্র লোক ঝাঁকিয়া আসিতেছে। কেহ গান করিয়া বা নৃত্য করিয়া অর্থলাভ করিতেছে, কেহ ভেল্কি দেখাইতেছে, কেহ সাপ খেলাইতেছে, কেহ হাত গণিয়া বলিতেছে। গণক বলিয়া পরিচয় দিয়া অনেকেই তথায় আসিয়াছে এবং রৌদ্রে আপন আপন জীর্ণবস্ত্র পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছে। একদিকে একখানা যন্ত্র, আর একদিকে একখানি করিয়া পুস্তক। অনেক লোক তাহাদের নিকট ছুটিতেছে, কুলকামিনীরাও শুভ্রবসনে মণ্ডিত হইয়া ব্যগ্র হইয়া আসিতেছে এবং এক এক পয়সা দিয়া হাত দেখাইয়া লইতেছে।

তাহাদের মধ্যে নরেন্দ্র এক অপরূপ গণক দেখিতে পাইলেন। তাহার বয়স চতুর্দশ বৎসরের অধিক হইবে না, মুখমণ্ডল অতিশয় কোমল ও অতিশয় গৌরবর্ণ, সূর্যতাপে আরক্ত হইয়া গিয়াছে। চক্ষু, গণ্ডস্থল এবং স্কন্ধের উপর জটা পড়িয়াছে; জটা দ্বারা ঈষৎ আবৃত হইলেও চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। মস্তক হইতে পদ পর্যন্ত সমস্ত শরীর কৃষ্ণবসনে আবৃত, কোমরে একটি বহুমূল্য পেটী রৌদ্রে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। বালক তাতারদেশীয় মুসলমান, কাহারও নিকট পয়সা না লইয়া হাত দেখিতেছে।

তাতার-বালকের আকৃতি দেখিয়াই অনেকে তাহার নিকট যাইতেছে। গজপতি ও নরেন্দ্র উভয়েই তাহার নিকটে গেলেন।

গজপতি প্রথমে হাত দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'অদ্য সন্ধ্যার সময়েই আমরা দিল্লী-নগরী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব, বল দেখি ?"

তাতার গজপতির মুখ ও বসন বিশেষ করিয়া দেখিয়া বলিল,—"মহারাজা যশোবন্তসিংহ নর্মদাতীরে গিয়াছেন, তুমি সেইস্থানে যাইবে।"

গজপতি উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন,—"মহারাজা যশোবন্তসিংহ আওরংজীবের সহিত যুদ্ধে গমন করিয়াছেন, তাহা আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জানে। আর আমি রাজপুত, আমার বসন দেখিয়া সকলেই বলিতে পারে। ইহার অধিক বলিবার তোমার বিদ্যা নাই।"

তাতার প্রজ্বলিত নয়নে গজপতির উপর স্থিরদৃষ্টি করিয়া ক্ষণেক পর মস্তক নাড়িয়া জটাভার পশ্চাদ্দিকে ফেলিয়া বলিল, "রাজপুত! আরও বলিতে পারি, আওরংজীবের হস্তে সমস্ত রাজপুতের নিধন হইবে। মহারাজকে বলিও, যেন দ্রুতগতি একটি অশ্ব বাছিয়া লয়েন, নতুবা পলাইবার সময় পাইবেন না। সপ্ত সহস্র রাজপুতের মধ্যে সপ্ত শতেরও রক্ষা নাই। রাজপুত! সে যুদ্ধে তোমার নিধন নিশ্চয়।"

গজপতি সাহসী যোদ্ধা, কিন্তু তাতার বালকের আকার ও গম্ভীর স্বর ও প্রজ্বলিত চক্ষু দেখিয়া ও কথা শুনিয়া মুহূর্তের জন্য তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। মুহূর্তমধ্যে সে ভাব অন্তর্হিত হইল, অতিশয় গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"ক্ষতি নাই, যদি জগদীশ্বর ললাটে তাহাই লিখিয়া থাকেন, মহারাজের যুদ্ধে হৃদয়ের শোণিতদান অপেক্ষা রাজপুত অধিকতর গৌরবের কার্য জানে না।"

সকলে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে নরেন্দ্র আপন হাত দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি যদি যথার্থ হাত দেখিতে জান, বল দেখি, কল্য নিশাকালে আমি কোথায় ছিলাম এবং কাহাকেই বা দেখিয়াছিলাম ?"

তাতার অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিল,

পরে ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল—"যুবক! কোন মুসলমানী তোমার প্রণয়িনী, তুমি কল্য রজনীতে তাহাকে দেখিয়াছিলে!"

গজপতিসিংহ হাসিয়া উঠিলেন, সকলে হাসিয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ হাসিলেন না, তাতারের কথা শুনিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর তাতার নরেন্দ্রকে একদিকে ডাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"যুবক, দিল্লীতে তোমার মহাবিপদ, তুমি কি তাহা জান না? দিল্লী ত্যাগ করিয়া অদ্যই পলায়ন কর. তোমার বন্ধুর সহিত অদ্যই নর্মদাতীরে গমন কর। এ দেওয়ানাও সেইদিকে যাইতেছে। যদি অনুমতি দাও, তোমার সঙ্গে যাইব। দেওয়ানা তোমার অপকার করিবে না, বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে।"

নরেন্দ্রনাথ আরও বিস্মিত হইলেন। এ বালক কে? বালক কি যথার্থই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলিতে পারে? বালক কি যথার্থই গত রাত্রির কথা জানে? দেওয়ানা যেই হউক, নরেন্দ্রনাথের হিতাকাঙ্ক্ষী; সম্ভবতঃ নরেন্দ্রনাথকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। ভাবিয়া চিন্তিয়া নরেন্দ্রনাথ তাহাকে নিকটে রাখিতে সম্মত হইলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার সময়েই গজপতি, নরেন্দ্র ও তাতার-বালক দিল্লী ত্যাগ করিয়া নর্মদাভিমুখে চলিলেন।

॥ পনের ॥

১৬৫৮ খৃঃ অব্দে বসন্তকালে প্রাচীন উজ্জয়িনী নগর ও তরঙ্গ-বাহিনী সিপ্রানদীর অপরূপ দৃশ্য দর্শন করিল। চন্দ্র উদিত হইয়াছে, তাহার উজ্জ্বল কিরণে সিপ্রা নদীর উভয় কূলে যতদূর দেখা যায়, শুভ্র শিবিরশ্রেণী দেখা যাইতেছে। একদিকে রাজা

যশোবন্ত ও তাঁহার সহযোদ্ধা কাসেম খাঁর অসংখ্য সেনা চন্দ্র-করোজ্জ্বল শিবিরশ্রেণীর ভিতর বিশ্রাম করিতেছে, অপর তীরে এক পর্বতোপরি আওরংজীব ও মোরাদের মোগল সৈন্যদল রহিয়াছে। মধ্যে কলনাদিনী সিপ্রা নদী প্রস্তরশয্যার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, যেন মোগল ও রাজপুতদিগের যুদ্ধের আয়োজন দেখিয়া ভীত না হইয়া উপহাস করিয়া যাইতেছে। দূরে ভারতবর্ষের কটিবন্ধনস্বরূপ বিন্ধ্যপর্বত চন্দ্রালোকে দেখা যাইতেছে। কল্য ভীষণ যুদ্ধ হইবে, কিন্তু অদ্য সমস্ত জগৎ সুপ্ত। কেবল সময়ে সময়ে প্রহরীর স্বর নিস্তব্ধ রজনীতে সুদূর পর্যন্ত শ্রুত হইতেছে, কেবল সিপ্রানদীর তরঙ্গমালা কল্-কল্ করিতেছে, কেবল দূর হইতে নৈশ শৃগালের শব্দ নদীকূলে ও পর্বতশ্রেণীতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

একটি শিবিরে নরেন্দ্র শয়ন করিয়া নিদ্রিত আছেন, তথাপি যুদ্ধের নানারূপ চিন্তা স্বপ্নরূপে তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন কথা হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে। সিপ্রা নদীর কল্-কল্ নাদ যেন ভাগীরথীর শব্দ বোধ হইল, সেই ভাগীরথীতীরে, সেই কুঞ্জবন-বেষ্টিত উচ্চ অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। তীরে বালুকারাশি, বালুকারাশিতে দুইজন বালক ক্রীড়া করিতেছে, আর একজন বালিকা দাঁড়াইয়া যেন গান গাহিতেছে, সে প্রেমপুত্তলী কে? সে কোথায়? ভাগীরথীতীরস্থ কুঞ্জবনে সেই তিনটি শিশু রজনীতে ক্রীড়া করিত সত্য, কিন্তু কালের নিষ্ঠুর গতিতে সে চিত্রটি বিলুপ্ত হইয়াছে।

স্বপ্ন পরিবর্তিত হইল। ভাগীরথীর কল্লোল নহে, এ রমণী গীতধ্বনি। রমণী না অপ্সরা? উচ্চ প্রাসাদ, তাহার ছাদ ও স্তম্ভ সুবর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত, তাহার মধ্যে এক অপ্সরা গান করিতেছে। কেবল একজন অপ্সরা গান করিতেছে, সে বড় দুঃখের গীত, জেলেখা কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে দুঃখের গীত গাহিতেছে। ঐ যে জেলেখা দাঁড়াইয়া আছে! ঐ যে তাহার রত্নরাজি-বিভূষিত কেশপাশে

উজ্জ্বল বদনমণ্ডল কিঞ্চিৎ আবৃত রহিয়াছে; ঐ যে তাহার নয়নদ্বয় হইতে দুই একবিন্দু জল পড়িতেছে।

স্বপ্ন পরিবর্তিত হইল। এ জেলেখা নহে, সেই তাতার-বালক গীত গাহিতেছে। যে ব্যর্থ প্রেম করিয়া প্রেমের প্রতিদান পায় নাই, সে দেওয়ানা হইয়া দেশে দেশে বেড়াইতেছে, তাহারই গান। গান শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শিবির হইতে বাহিরে আসিলেন। জগৎ নিস্তব্ধ, দ্বিপ্রহর নিশার বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে, চন্দ্রকিরণে নদী, পর্বত, শিবির ও মাঠ দৃষ্ট হইতেছে, আর সেই অভাগা দেওয়ানা তাতার-বালক শিবির-দ্বারে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে। সপ্তস্বর-মিলিত সে গান বায়ুতে বাহিত হইয়া নৈশ গগনে উত্থিত হইতেছে ও চারিদিকে আকাশে বিস্তৃত হইতেছে।

নরেন্দ্র সাশ্রুনয়নে বালকের হস্তধারণ করিয়া তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি যথার্থই প্রেমের জন্য দেওয়ানা হইয়াছ? তোমার হৃদয়ে কি কোন গভীর দুঃখ আছে? তাহা যদি হয়. আমাকে বল, আমি তোমার দুঃখের সমদুঃখী হইব। মন খুলিয়া আমায় সমস্ত কথা বল।"

বালক একদৃষ্টিতে নরেন্দ্রের দিকে চাহিতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। ক্ষণেক পর হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে করুণ স্বরে বলিল,—"মার্জনা করুন, আমি দেওয়ানা, যখন যাহা মনে আইসে, তাহাই গান করি।" নরেন্দ্র অনেক প্রবোধবাক্য প্রয়োগ করিয়া বার বার তাহার দুঃখের কারণ ও এই অল্পবয়সে ফকিরি গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক তাহার উত্তর দিল না, কেবল বলিল—"আমি দেওয়ানা।"

নিশা অবসানে নরেন্দ্র রণসজ্জা করিয়া আপন বন্ধু গজপতি-সিংহের শিবিরে গেলেন, দেখিলেন, তিনিও যোদ্ধার কার্য করিতেছেন; আপন তরবারি, বর্ম প্রভৃতি স্বয়ং শানাইতেছেন; অস্ত্রগুলি রৌপ্যের মত উজ্জ্বল হইয়াছে, তথাপি আরও উজ্জ্বল

করিতেছেন। দেখিয়া নরেন্দ্র কিছু বিস্মিত হইলেন। পরে শয্যার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, গজপতি সমস্ত রাত্রি শয়ন করেন নাই, সমস্ত রাত্রিই এই কার্য করিয়াছেন। তাঁহার বদমণ্ডল অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষুদ্বয় ঈষৎ কালিমাবেষ্টিত। কেন? নরেন্দ্র গত কয়েক দিন অবধি গজপতির যে ভাবগতিক দেখিয়াছিলেন, তাহাতে কারণ কিছু কিছু বুঝিতে পারিলেন। দেওয়ানা বালক হাত-দেখা অবধি গজপতি স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিলেন, উজ্জয়িনীর যুদ্ধে তাঁহার নিধন হইবে। বোধ হয়, গত নিশায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, শয়নের অবসর পান নাই।

পাঠক, গজপতিকে ভীরু মনে করিতেছ? রাজপুত সকলেই সাহসী, তথাপি তাহাদের মধ্যেও তেজসিংহের পুত্র গজপতি অপেক্ষা সাহসী কেহ ছিল না। তথাপি কল্য নিশ্চয় মৃত্যু জানিলে সাহসীর ললাটেও চিন্তারেখা অঙ্কিত হয়। যোদ্ধা যৌবনমদে মত্ত থাকিয়া, জীবনের সুখে মগ্ন থাকিয়া, যুদ্ধের উৎসাহে প্রফুল্ল থাকিয়া জয়ের আশায় আশ্বস্ত হইয়া মৃত্যুর চিন্তা দূর করে; যুদ্ধ তাহাদের পক্ষে আমোদ মাত্র, অনেক লোক মরিতেছে, তাহারাও একদিন মরিবে তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু "কল্য মরিবে" বজ্রধ্বনিতে যদি এই শব্দ সহসা হৃদয়ে আহত হয়, তাহা হইলে সে উৎসাহ ও সে প্রফুল্লতা হ্রাস পায়। গজপতি সে সময়ে সকল লোকের ন্যায় গনণ-বিদ্যায় দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। অদ্য যুদ্ধে তিনি মরিবেন, তাহা তাহার বিশ্বাস ছিল। গত রজনীতে অনিদ্র হইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অস্ত্র পরিষ্কার করা কেবল কাল কাটাইবার একটি উপায়মাত্র।

নরেন্দ্র আসিবামাত্র গজপতি উঠিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"দেখ দেখি, অস্ত্রগুলি পরিষ্কার হইয়াছে কি না?

নরেন্দ্র। যথার্থই কি আপনি অদ্য যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন? দেওয়ানা ফকিরের কথা স্মরণ করুন।

গজপতি। সম্মুখে রণ করিয়া রাজপুত কখনও পশ্চাতে চাহে না, পিতা তেজসিংহ আমাকে এই শিক্ষা দিয়াছেন।

গজপতি আরও বলিলেন,—"নরেন্দ্র, এক যুদ্ধে আমি মহারাজা যশোবন্তসিংহের উপকার করিয়াছিলাম, রাজা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এই মুক্তাহার প্রদান করেন। সেই অবধি সকল যুদ্ধেই আমি এই হার পরিধান করিয়াছি। অদ্যকার যুদ্ধে তুমি নিস্তার পাইবে, এই হার রাজাকে দিও এবং বলিও, দেশে আমার দুইটি শিশু-সন্তান আছে, হতভাগাদের মাতা নাই। মহারাজকে বলিও, যেন অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগের উপর কৃপাদৃষ্টি করেন, বালক রঘুনাথও কালে রাজার আজ্ঞায় পিতার ন্যায় সংগ্রামে জীবন দিতে সক্ষম হয়, ইহা অপেক্ষা অধিক মঙ্গল ইচ্ছা তাহার পিতা জানে না।

নরেন্দ্র নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাঁহার নয়ন হইতে একবিন্দু জল পড়িল। গজপতির নয়নদ্বয় শুষ্ক ও অতিশয় উজ্জ্বল।

সহসা ভেরী-শব্দ শুনা যাইল, আওরংজীব সিপ্রা নদী পার হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। গজপতি রণসজ্জা পরিধান করিয়া বাহিরে আসিলেন, লম্ফ দিয়া অশ্বে আরোহণ করিয়া তীরবেগে নদীমুখে চলিলেন।

নরেন্দ্রও নির্গত হইয়া যুদ্ধাভিমুখে চলিলেন।

॥ ষোল ॥

যুদ্ধের পূর্বদিশায় রাজপুত-শিবির পাঠক দর্শন করিয়াছ। একবার সেই দিশায় মোগল-শিবির দর্শন কর।

আওরংজীব পূর্বেই সেইস্থানে পৌঁছিয়াছিলেন, মোরাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। দুই-তিন দিন পরে মোরাদ সসৈন্যে আওরংজীবের সহিত যোগ দিলেন, দুই-তিন দিনের মধ্যে যদি যশোবন্তসিংহ আওরংজীবকে আক্রমণ করিতেন, আওরংজীব অবশ্যই

পরাস্ত হইতে। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন যে, আওরংজীবের অল্পমাত্র সৈন্য আছে, এ কথা যশোবন্ত জানিতেন না, সেইজন্য আক্রমণ করেন নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, মহানুভব রাজপুত সেনাপতি সে কথা জানিয়াও অল্পসংখ্যক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা রীতিবিরুদ্ধ, এইজন্যই অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

আজি আওরংজীব ও মোরাদ দুই ভ্রাতায় সাক্ষাৎ হইয়াছে, কালি যুদ্ধ হইবে; জয় জয় নাদে দেশ পরিপূর্ণ হইতেছে। পট্টবস্ত্রমণ্ডিত উৎকৃষ্ট দীপালোকশোভিত একটি প্রশস্ত শিবিরে দুই ভ্রাতা ভোজন করিতে বসিয়াছেন. চারিরিকে জগদ্বিমোহিনী নর্তকী ও গায়কগণ নৃত্যগীতাদি করিয়া রাজপুত্রদ্বয়ের মনোরঞ্জন করিতেছে। মোরাদেব প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষস্থল, বীর আকৃতি ও অকপট হৃদয়; আওরংজীবের ললাট কুঞ্চিত, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও তীব্র, মন সর্বদাই সহস্র চিন্তায় অভিভূত। তথাপি আওরংজীব কি সুন্দব সরল হাসিই হাসিতেছেন কি সম্মান সহকারে মোরাদের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন, যেন ভ্রাতাকে দেখিয়া তিনি আর আনন্দ রাখিতে পারিতেছেন না, যেন ভ্রাতার কার্যসাধন অপেক্ষা জগতে তাঁহাব অন্য আমোদ বা অন্য কোনও প্রকার উদ্দেশ্য নাই।

ভোজন সাঙ্গ হইল, ভৃত্যেরা ফল ও মদিরা লইয়া আসিল। গায়কীগণ পুনরায় সপ্তসরে গান আরম্ভ করিল, শিবির আমোদিত হইল। কেশের হীরকের সহিত কটাক্ষদৃষ্টির জ্যোতিঃ মিশিয়া যাইতে লাগিল, সুললিত গানের সহিত সুমিষ্ট হাস্যধ্বনি মিশিয়া যাইতে লাগিল, মোরাদ একেবারে বিমোহিত হইলেন। অবশেষে আওরংজীবের ইঙ্গিতে নর্তকীগণ চলিয়া গেল।

আওরংজীব সুবর্ণ-পাত্রে মদিরা ঢালিয়া মোরাদের হস্তে দিয়া বলিলেন,—"আজি সেবায় আপনাকে তুষ্ট করিতে পারিয়াছি, আজি আমার জীবন সার্থক।"

মোরাদ। আওরংজীব, আপনার ন্যায় অমায়িক ভ্রাতা আমি পাইব না। একটু মদিরা আপনার জন্য লউন।

আওরংজীব। ক্ষমা করুন, আপনি জানেন, আমার জীবনে সুখের বাঞ্ছা নাই। হৃদয়ে বড় মানস আছে, আপনার মতো বীরপুরুষকে পিতৃসিংহাসনে একবার দেখিব, ইহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় ইচ্ছা নাই। পৈগম্বর যদি এই এরাদা সফল করেন, তাহা হইলে সন্তুষ্ট মনে ফকিরি গ্রহণ করিয়া মক্কায় যাইব।—এই বলিয়া আওরংজীব আর এক পাত্র মদিরা দিলেন।

মোরাদ। আওরংজীব, আপনি যথার্থই ধার্মিক, তাহা না হইলে আমার জন্য আপনি এরূপ যত্ন করিবেন কেন?

আওরংজীব। কাহার জন্য করিব? তৈমুরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার উপযুক্ত আর কে আছে? সুজা বিলাসপ্রিয় ও ভীরু সুজা তৈমুরের সিংহাসন কলঙ্কিত করিবে। আত্মাভিমানী মূর্খ কাফের দারা তৈমুরের সিংহাসন কলুষিত করিবে। তাহা অপেক্ষা পুনরায় হিন্দুস্থান কাফেরদিগের হাতে যাউক, তৈমুরের নাম বিলুপ্ত হউক। ইহাদের জন্য আমি যুদ্ধ করিব না; যাঁহার সাহস অপরিসীম, যাঁহার যশোরাশিতে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়াছে. যিনি মোগল সিংহাসনের স্তম্ভস্বরূপ, যিনি মোগলকুলের কুলতিলকস্বরূপ, তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিব। আমি আপনার সম্মুখে আপনার সুখ্যাতি করিতে চাহি না, কিন্তু যখন আমি আপনাকে দেখি, আমার যথার্থই বোধ হয় যেন আপনার উদার ললাটে 'সম্রাট্' শব্দ খোদিত রহিয়াছে, আপনার বিশাল বক্ষস্থল ও দীর্ঘ বাহুতে 'যোদ্ধা' শব্দ অঙ্কিত রহিয়াছে, আমার জীবন ধন্য যে, এই বীরপুরুষের কার্য্য-সাধনে আমি লিপ্ত হইয়াছি।—এই বলিয়া আওরংজীব সুবর্ণপাত্র আর একবার মদিরায় পরিপূর্ণ করিলেন।

মোরাদ। আওরংজীব, আমি যথার্থই আপনার বাক্যে পরিতুষ্ট হইলাম। কাল যুদ্ধ হইবে, সৈন্য সকল প্রস্তুত আছে?

আওরংজীব। আমি তিন-চারি দিন হইতেই প্রস্তুত আছি, কিন্তু যুদ্ধব্যবসায়ে আমি এখনও অপরিপক, একাকী সাহস হয় না। আপনি নিকটে থাকিলে আমার যেন বোধ হয়, আমি পর্বত-পার্শ্বে নিরাপদে আছি, আমার সাহস দ্বিগুণ হয়।

মোরাদ এরূপ আত্মাভিমানী ছিলেন যে, প্রবঞ্চনা এবং চাটু-বাক্যও তাঁহার সত্য বলিয়া জ্ঞান হইত। বিশেষতঃ এক্ষণে অধিক মদিরা সেবনে কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। আওরংজীবের প্রশংসাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"ভ্রাতঃ! আপনিও কালে রণপণ্ডিত হইবেন, এক্ষণে কিছুদিন আমার উপর নির্ভর করুন। আর আমি আমি জগতে কাহারও উপর নির্ভর করি না, কেবল আমার সাহস ও এই অসির উপর ভরসা করি।"--এই বলিয়া মোরাদ অসি নিষ্কাষিত করিলেন, দীপালোকে অসি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। পুনরায় অসি কোষে রাখিতে গেলেন, কিন্তু অতিশয় মদিরা সেবনে দৃষ্টি স্থির ছিল না, অসি মৃত্তিকায় পড়িয়া যাইল। আওরংজীব হাস্য সংবরণ করিয়া আর এক পাত্র মদিরা দিলেন, মোরাদ তাহাও শেষ করিলেন।

আওরংজীব বলিলেন,—"ভ্রাতঃ! তবে বিদায় হই, রণক্ষেত্রে আবার আপনার দর্শন পাইব।"

মোরাদ। যাও, আওরংজীব, যাও, আমি আপনার উপর বড়ই পরিতুষ্ট হইলাম, আইস আলিঙ্গন করি।

মোরাদ আলিঙ্গন করিতে উঠিলেন, কিন্তু অধিক মদিরা সেবন বশতঃ ভূমিতে ঢলিয়া পড়িলেন।

আওরংজীবের মুখের ভাব তখন পরিবর্তিত হইল, ভ্রাতাকে যে সহাস্য মুখ দেখাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা পরিবর্তিত হইল। মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, ললাটে দুই তিনটি ভীষণ রেখা অঙ্কিত হইল; নিঃশব্দে সেই শিবির মধ্যে পদসঞ্চারণ করিতে লাগিলেন; মধ্যে মধ্যে এক একবার হঠাৎ দণ্ডায়মান হয়েন, স্থিরদৃষ্টিতে এক একবার দেখেন, যেন সম্মুখে কোন দ্রব্য দেখিতে পাইতেছেন, আবার পদসঞ্চারণ করিতে থাকেন। এক একবার মুখে ঈষৎ হাস্য লক্ষিত হয়, আবার বদনমণ্ডল কঠোর ভাব ধারণ করে, ললাট কুঞ্চিত হয়।

একবার স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, একদিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া

অর্ধস্ফুট বচনে বলিতে লাগিলেন,—"উজ্জ্বল মণিময় মুকুট, ময়ূর-সিংহাসন প্রশস্ত ভারতপ্রদেশ পিতার দুর্বল হস্ত হইতে স্খলিত হইতেছে। কে লইবে? দারা, সাবধান! তোমার সাহস আছে, বল আছে, কিন্তু আমিও দুর্বল হস্তে অসি ধারণ করি নাই, পথ ছাড়িয়া দাও, নচেৎ অসিহস্তে পথ পরিষ্কার করিব। তুমি আত্মাভিমানী, দর্পী, কিন্তু তোমা অপেক্ষা ভীষণ দর্প ও দৃঢ়তর ব্রত সহাস্য বদনের ভিতর লুক্কায়িত থাকে। মোরাদ! তুমি সাহসী বীর। সিংহাসনে বসিবে? তবে শূকর যেমন কর্দমে পড়ে, সেইরূপ তুমি ধরাতলে লুটাইয়া পড়িলে কেন? বন্যশূকরেরও তোমার ন্যায় সাহস আছে। অচেতন? কল্য যুদ্ধ হইবে, অদ্য বিহাসবিহ্বল? যত দিন আবশ্যক, তোমার দ্বারা আমার কার্য-সিদ্ধি করিব, তাহার পর এইরূপ পদাঘাত করিয়া তোমাকে দূরে ফেলিয়া দিব। কল্য যুদ্ধ হইবে, ললাটের লিখন কি আছে? পিতার হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ভ্রাতার শোণিতে দেশ প্লাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভীষণ উদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই। হৃদয়! সাহসে নির্ভর কর, আরও অগ্রসর হইব। অসিহস্তে কণ্টকময় পথ পরিষ্কার করিব, আবশ্যক হয়, উজ্জয়িনী হইতে আগ্রা পর্যন্ত পথ নররক্তে রঞ্জিত করিব, কিন্তু এ ভীষণ প্রতিজ্ঞা বিচলিত হইবে না। পিতামহ তৈমুর! তোমার মুকুটে এই ললাট শোভিত করিব, নচেৎ কল্য হৃদয়শোণিতে সিপ্রাবারি রঞ্জিত করিব।"

॥ সতের ॥

১৬৫৮ খৃঃ অব্দে বৈশাখ মাসে ভীষণ যুদ্ধ হইল। মোরাদ ও আওরংজীবের সৈন্যেরা সিপ্রা নদী পার হইবার উদ্যম করিতে লাগিল, কিন্তু সে বড় সহজ ব্যাপার নহে। আওরংজীব সৈন্য পার হইবার জন্য অতিশয় নিপুণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উন্নত স্থানে তাঁহার কামান সাজাইয়া, সম্মুখে শত্রুর আগমন রোধ করিয়া

নিজ সৈন্যকে নদী পার হইতে বলিলেন। শক্রুরাও কামান সাজাইয়াছিল তদ্দারা আওরংজীবের সৈন্যের নদী পার হওয়া নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, অনেকক্ষণ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। যশোবন্তসিংহ অপূর্ব বীর্যবল প্রকাশ করিয়া মোগলদিগের গতিরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সহযোদ্ধা কাসেম খাঁ সেরূপ যত্ন করিলেন না। তাৎকালিক লেখকেরা সন্দেহ করেন যে, তিনি আওরংজীবের অর্থে বশীভূত হইয়া আপন গোলা ও বারুদ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সৈন্যের কামান অচিরাৎ নিস্তব্ধ হইল। এ অবস্থায় শক্রুর কামানের সম্মুখে যুদ্ধ করা যশোবন্তের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল; কিন্তু তিনি ভগ্নপ্রযত্ন না হইয়া অমানুষিক বীরত্ব প্রকাশপূর্বক শক্রুদিগের গতিরোধ করিতে লাগিলেন। সেখান পর্বতময়; সুতরাং আক্রমণকারীগণ সহজে নদী পার হইতে পারিল না, কিন্তু সাহসী মোরাদ কতিপয় সৈন্য লইয়া সকল ব্যাঘাত অতিক্রম করিয়া জয় জয় নাদে নদী পার হইলেন, তাহা দেখিয়া সমস্ত সৈন্য নদী পার হইল। ভীরু কাসেম খাঁ তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে পলায়ন করিলেন, সুতরাং যশোবন্ত-সিংহের বিপদ সীমা রহিল না। কিন্তু সেই অসমসাহসী রাজপুত চতুর্দিকে শক্রুবেষ্টিত হইয়াও তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ক্ষীণ হইতে লাগিল, তাঁহার প্রিয় অনুচরেরা চতুর্দিকে হত হইতে লাগিল, মোগলেরা জয় জয় নাদে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিতে লাগিল, তথাপি বীর রাজপুতেরা রণে ভঙ্গ দিল না। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর পরাস্ত হইয়া যশোবন্ত-সিংহ কেবলমাত্র পঞ্চ শত সেনা লইয়া যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিলেন। সপ্ত সহস্র রাজপুত সেইদিন সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনদান করিল।

।। আঠার ।।

যশোবন্তসিংহের অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক সেনা রাজপুতানা অভিমুখে

আসিতে লাগিল। নরেন্দ্র তাঁহার পরম বন্ধু গজপতির মরণে অতিশয় দুঃখিত ও ক্লিষ্ট হইলেন, কিন্তু প্রত্যহ নূতন নূতন দেশ দেখিতে দেখিতে সে দুঃখ কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিস্মৃত হইলেন। কয়েকদিন আসিতে আসিতে সৈন্যেরা অবশেষে রাজপুতানার অভ্যন্তরে আসিয়া পড়িল। যশোবন্তসিংহ মাড়ওয়ার দেশের রাজ, সে দেশে আসিতে হইলে মেওয়ার দেশের অভ্যন্তর দিয়া আসিতে হয়।

মেওয়ার দেশের অসংখ্য দুর্গ দেখিয়া নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। দুর্গগুলি প্রায়ই পর্বতচূড়ায় নির্মিত, সহসা হস্তগত করা শত্রুর দুঃসাধ্য। পর্বতগুলি উন্নত শিরে মুকুটস্বরূপ দুর্গ ধারণ করিয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। সে সমস্ত দুর্গে উঠিবার পথ নাই, কেবল একদিকে সোপানের ন্যায় পথ আছে, তাহার উপর দিয়া লোকে গমনাগমন করে। যুদ্ধকালে দুর্গের ভিতর খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত হয়, সেই একটিমাত্র দ্বার রুদ্ধ হয়, পরে শত্রুগণ যাহাই করুক না, দুর্গবাসিগণ নিশ্চিন্তে থাকিতে পারে।

শত্রুরা দুর্গে উঠিবার উপক্রম করিলে উপর হইতে প্রস্তর-রাশি নিক্ষিপ্ত হয়, ঐ প্রস্তরাঘাতে একেবারে বহুসংখ্যক শত্রু বিনষ্ট হয়।

এইরূপ দুর্গ দেখিতে দেখিতে সৈন্যেরা অবশেষে একদিন সন্ধ্যার সময় চিতোরের দুর্গের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সৈন্যেরা আহারাদি সমাপ্ত করিয়া আপন আপন শিবিরে বিশ্রাম করিতে গেল, কিন্তু নরেন্দ্র কতিপয় রাজপুতের সহিত চিতোর পর্বতে উঠিয়া তাহার উপরিস্থ দুর্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র বিস্মিত-নয়নে কুম্ভ রাজার সুন্দর স্তম্ভ দেখিলেন, পদ্মিনী রাজ্ঞীর প্রাসাদ ও সরোবর দেখিলেন, যে সিংহদ্বারে রাজপুত যোদ্ধৃগণ বার বার অসিহস্তে জীবনদান করিয়াছেন, তাহা দেখিলেন, যে চিতায় রাজপুত-রমণীগণ চিতারোহণ করিয়া কুল-মান রক্ষা করিয়াছেন, সেই চিতার গহ্বর দেখিলেন।

সহসা তাঁহাদের সম্মুখে একজন বৃদ্ধ মনুষ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজপুতদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, তিনি চিতোরের পুরাতন "চারণ"। চারণগণ পূর্বকালে রাজপুতানার রাজাদিগের গৌরবগীত গাইয়া রাজপুরুষ ও নগরবাসীদের মনোরঞ্জন করিতেন; রাজপুতানায় এখন পর্যন্ত সন্ধ্যার সময়ে লোকে সমবেত হইয়া চারণের গীত শুনিতে ভালবাসে, পূর্ব-গৌরবগান শুনিতে শুনিতে তাহাদিগের নয়ন বীরাশ্রুতে আপ্লুত হয়।

নরেন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গী রাজপুতগণ চারণকে একটি শিলার উপর বসাইলেন ও আপনারা চারিদিকে বসিয়া প্রতাপসিংহের গান শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চারণ সেই গান আরম্ভ করিলেন।

"রাজপুতগণ! এটি আমার গীত নহে, অম্বর গর্জন-প্রতিঘাতী পর্বতশৃঙ্গের গীত, বজ্রনাদ জলপ্রপাতের গীত, তোমরা শ্রবণ কর। যে পর্বতকন্দরে একজন রাজপুত-সেনার অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে, সেই গহ্বর হইতে এই গীত বহির্গত হইতেছে। যে পর্বততরঙ্গ বাহিনীর জল রাজপুতের একবিন্দু শোণিতেও আরক্ত হইয়াছে, সেই তটিনীর কূলে এই গীত ধ্বনিত হইতেছে। প্রতাপসিংহ! এটি তোমার গীত।

ঐ দেখ, আকবরের ভীষণ প্রতাপে সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইতেছে, কিন্তু প্রতাপের হৃদয় কম্পিত হইল না। চিতোর নগর আর তাঁহার নাই, তাঁহার পিতার রাজত্বকালে নিষ্ঠুর আকবর চিতোর কাড়িয়া লইয়াছেন। দুর্গরক্ষার্থ জয়মল্ল জীবন দিয়াছিল, পত্তে মাতা ও বনিতা স্বহস্তে যুদ্ধ করিয়া জীবনদান করিয়াছিল, তথাপি রাজপুতের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া আকবর চিতোর কাড়িয়া লইলেন। প্রতাপ যখন রাজা হইলেন, তখন চিতোর নাই, সৈন্য নাই, অর্থ নাই, কিন্তু তাঁহার বীরান্তঃকরণ ছিল, বীরের দুঃসাধ্য কি আছে? প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজপুতরাজগণ দিল্লীর দাসত্ব স্বীকার করিলেন,

প্রতাপ করিলেন না। অম্বরের ভগবানদাস ও মাওয়ারের মল্লদেব নিজ নিজ দুহিতাকে দিল্লীর সম্রাট্‌হস্তে অর্পণ করিলেন, মহানুভব প্রতাপ ম্লেচ্ছের কুটুম্ব হইতে অস্বীকার করিলেন। কেন স্বীকার করিবেন? মেওয়ারাধিপতিরা সূর্যবংশাবতংস, সে উন্নত বংশ কেন কলুষিত করিবেন?

সাগরতরঙ্গের ন্যায় দিল্লীর সেনা মেওয়ার প্লাবিত করিল, তাহার সঙ্গে—হা জগদীশ! এ লজ্জার কলঙ্ক কেন রাজস্থানের ললাটে অঙ্কিত করিলে?—তাহার সঙ্গে রাজপুতরাজগণ যোগ দিলেন। মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীর, বুন্দী প্রভৃতি নানা দেশের রাজারা আপনাদিগের দাসত্বের কলঙ্ক অপনীত করিবার জন্য প্রতাপকেও দিল্লীর দাস করিবার জন্য আকবরের সহিত যোগ দিলেন। অম্বরের মানসিংহ প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, মহানুভব প্রতাপ ম্লেচ্ছের কুটুম্বের সহিত ভোজন করিতে অস্বীকার করিলেন। সরোষে মানসিংহ দিল্লী যাইয়া অসংখ্য সেনাতরঙ্গে মেওয়ার দেশ প্লাবিত করিলেন। মানসিংহ! তুমি কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া শত্রুদমন করিয়াছিলে,—কাহার জন্য? হায়! ম্লেচ্ছের অধীন হইয়া রাজপুত নাম ডুবাইলে? ম্লেচ্ছের পদরজঃ রাজপুতের ললাটে কি সুন্দর শোভা পাইতেছে!

অন্ধকারে ঐ জলপ্রপাতের ভীষণ তেজ দেখিতে পাইতেছ? না, তোমরা পাইবে না, কিন্তু আমি অন্ধকারে থাকি, আমি দেখিতেছি। উহার মধ্যস্থলে উন্নত শিলাখণ্ড সগর্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, জলপ্রপাতেও কম্পিত হইতেছে না। জলপ্রপাত অপেক্ষা অধিক তেজে সাগরগর্জনে মোগলসৈন্য আসিয়া মেওয়ার দেশ প্লাবিত করিল, শিলাখণ্ডের ন্যায় সগর্বে প্রতাপ দণ্ডায়মান রহিলেন। হল্‌দিঘাটে মহাযুদ্ধ হইল, সেনাদিগের রব পর্বতকন্দর হইতে প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল; আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘ হইতে প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল। কিন্তু সাহসে কি হইবে? মোগলেরা অসংখ্য

সেনা। দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুতের মধ্যে কেবল অষ্ট সহস্র লইয়া প্রতাপ পলায়ন করিলেন, অবশিষ্ট হল্‌দিঘাটের ভীষণ উপত্যকায় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিলেন।

এই কি একবার? বৎসর বৎসর এইরূপ সংগ্রাম হইল, বৎসর বৎসর প্রচুর সেনা, ধন. রাজ্য হ্রাস পাইতে লাগিল, বৎসর বৎসর তাঁহার জীবনাকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার বীরত্ব হ্রাস হইল না; তিনি দিল্লীর দাস হইলেন না।

রাজপুত! তোমাদের চক্ষুতে যদি জল থাকে, বিসর্জন কর, হৃদয়ে যদি শোণিত থাকে, বিসর্জন কর। ঐ দেখ, প্রতাপের রাজরানী পর্বতকন্দরে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছে, রাজরানী পর্বতকন্দরে শয়ন করিয়া আছেন, প্রতাপ খড়্গহস্তে জাগরিত হইয়া আছেন। ঐ দেখ, বৃক্ষ হইতে রজ্জু লম্বিত হইতেছে। কাষ্ঠাসনে কি দুলিতেছে? জগদীশ! রাজার শিশু-পুত্রেরা ঝুলিতেছে, নীচে রাখিলে হিংস্র জন্তু লইয়া যাইবে। ঐ দেখ, প্রতাপের পুত্রবধূ শুষ্ক পত্র জ্বালাইয়া খাদ্য প্রস্তুত করিতেছেন, রুটি প্রস্তুত হইল সকল খাইও না, অর্ধেক খাও, অর্ধেক রাখিয়া দাও, আবার ক্ষুধা পাইলে কোথায় পাইবে? ঐ শুন, ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল। একটি বালিকার হস্ত হইতে বন্য বিড়াল রুটি কাড়িয়া লইয়া গেল, রাজকন্যা ক্ষুধায় চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে।

রাজপুত! প্রতাপের জয়গীত গাও, তিনি পঞ্চবিংশ বৎসর মোগল-দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, পর্বতশিখরে বাস করিয়াছেন। পর্বত উপত্যকায় যুদ্ধ করিয়াছেন, পর্বতকন্দরে স্ত্রীপরিবারকে পালন করিয়াছেন; তথাপি ইহজন্মে আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। পর্বতে পর্বতে এই গীত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকুক, সমগ্র রাজস্থানে এই গীত শব্দিত হইতে থাকুক, হিমালয় হইতে প্রতিহত হইয়া সাগরবারি পর্যন্ত সঞ্চরণ করুক, হিমালয় অতিক্রম করিয়া সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হউক, আর যদি স্বর্গে সাহস ও স্বদেশানুরাগের

গৌরব থাকে, এই গীত আকাশপথে উত্থিত হইয়া স্বর্গের দ্বারে আঘাত করিয়া মানবের যশঃকীর্তি বিস্তার করুক।"

চারণের ভীষণ গর্জন শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল। ক্ষণপরে সকলেই চাহিয়া দেখিল, চারণ নাই। তাঁহার চিহ্নমাত্রও নাই, কেবল আকাশে মেঘরাশি ভীষণ গর্জন করিয়া যেন তাঁহার ভয়াবহ গীত বার বার ধ্বনিত করিতে লাগিল।

রাজপুতেরা স্বদেশের পূর্বগৌরব স্মরণ করিতে করিতে উৎসাহে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, যোদ্ধাদিগের চক্ষু বীরাশ্রুতে ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর তাহারা উঠিয়া আপন শিবিরে প্রস্থান করিল। নরেন্দ্র তাহাদের সহিত প্রস্থান করিলেন না, তিনি হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া সেই মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে ভীষণ চিতোর দুর্গের তলে বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। মেঘ ক্রমে গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে, নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন না। আকাশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্যন্ত উজ্জ্বল বিদ্যুল্লতা জগৎ ও গগনমার্গ চমকিত করিতে লাগিল, রহিয়া রহিয়া মেঘ ভীষণ গর্জনে পৃথিবী কম্পিত করিত লাগিল, রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু ভীষণ উচ্ছ্বাসে বহিতে লাগিল, নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন না।

নরেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন,—স্বদেশেও মহাবল-পরাক্রান্ত রাজারা আছেন, তবে সুন্দর বঙ্গদেশের এ দুর্দশা কেন? যুদ্ধই রাজপুতদের ব্যবসা; বালক, বৃদ্ধ সকলেই যুদ্ধশিক্ষা করে, তাহারা ধন দিয়াছে, ঐশ্বর্য দিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে, তথাপি স্বাধীনতা বিসর্জন দেয় নাই। তাহাদের গ্রাম দগ্ধ হইয়াছে, নগর লুণ্ঠিত হইয়াছে, দুর্গ শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে, তথাপি তাহারা গৌরব বিসর্জন দেয় নাই। সে গৌরবগীত আজিও আরাবল্লীর কন্দরে ও উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। আর বঙ্গদেশ! বেগপ্রবাহিনী গঙ্গানদী তাহার গৌরবগীত গায় না, ব্রহ্মপুত্র স্বাধীনতার গীত গায় না, রাজা-প্রজা সকলেই বড় সুখে নিদ্রা যাইতেছে। জগতে তাহাদের নাম নাই, বীরমণ্ডলীর মধ্যে তাহাদের স্থান নাই।"

পরদিন প্রাতে নরেন্দ্র অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, উক্ত চারণ শৈশবে মেওয়ারাধিপতি প্রতাপসিংহের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। বাল্যকালবধি চারণ প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে পর্বতগুহা ও উপত্যকায় বাস করিতেন ও সেই বাল্যকালেই রাজার কীর্তিগান রচনা করিয়া কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

দিল্লীশ্বরের সহিত অসংখ্য সংগ্রামের পর প্রতাপের যখন কাল হইল, তখন চারণের বয়ঃক্রম বিংশ বৎসর। সে আজ ষাট বছরের কথা, সুতরাং চারণের বয়ঃক্রম এক্ষণে প্রায় আশীতি বৎসর। তথাপি চারণ এখনও চিতোরের পবত-দুর্গে রজনীতে বিচরণ করেন। সকলে বলে, চারণ দেববলে বলিষ্ঠ।

প্রতাপের মৃত্যু সময়ে তিনি মৃত্যুশয্যার নিকটে পুত্র অমরসিংহকে আনিয়া শপথ করাইয়াছিলেন যে তিনিও পিতার ন্যায় চিরকাল মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন, অধীনতা স্বীকার করিবেন না। পিত্রাজ্ঞাপালনের জন্য অমরসিংহ অনেক বৎসর পর্যন্ত আকবর ও তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ও পিতার ন্যায় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধে চারণ সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন ও সর্বসময়ে পিতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উত্তেজিত করিতেন। কিন্তু সে উত্তেজনা বিফল, শেষে অমরসিংহ জাহাঙ্গীরের অধীনতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু সে নামমাত্র অধীনতা। তিনিই স্বদেশের রাজা রহিলেন, দিল্লীতে যে কর পাঠাইতেন তাহা দ্বিগুণ করিয়া সম্রাট তাহাকে ফিরাইয়া দিতেন। অমরসিংহকে দিল্লী যাইতে হইত না, তাঁহার পুত্র করুণ ও পৌত্র জগৎসিংহকে জাহাঙ্গীর তাঁহার মহিষী নুরজাহান সর্বদাই সমাদরের সহিত আহ্বান করিতেন ও অনেক মণিমুক্তা দিয়া পরিতুষ্ট করিতেন। ইহাকে প্রকৃত অধীনতা বলে না, তথাপি চারণ রোষে ও অভিমানে

অমরসিংহকে রাজা জ্ঞান না করিয়া অনেক কটূক্তি করিয়া প্রস্থান করিলেন। অমরসিংহও লজ্জিত হইলেন এবং পিতার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া রাজগদী ত্যাগ করিলেন; করুণ রাজা হইলেন।

আকবর কর্তৃক চিতোর ধ্বংস হওয়ার পরই উদয়পুর নামে এক সুন্দর রাজধানী নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু চারণ ভগ্ন চিতোরদুর্গে বাস করিতে লাগিলেন, একদিন দু'দিন অন্তর দুর্গ হইতে অবতরণ করিতেন, নীচে পল্লী-গ্রামবাসীরা যাহা দিত, তাহাই খাইতেন, আবার দুর্গে আরোহণ করিয়া থাকিতেন। এইরূপে নির্জনে বাস করিয়া চারণ উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন। পর্বতগহ্বর তাঁহার বাসস্থান হইয়াছে, মেঘগর্জন ও ঝটিকায় বন কম্পিত হইলে তাঁহার বড় উল্লাস হয়, তিনি স্বপ্ন দেখেন, যেন আবার প্রতাপ আকবরের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন।

রাজপুত সেনাগণ কয়েকদিন ভ্রমণ করিতে করিতে আরাবলী পার হইয়া যাইল। সেনাগণ কখন উপত্যকা দিয়া যাইত, দুই দিকে পর্বতরাশি মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে, শিখরগুলি যেন আকাশ হইতে অবলোকন করিতেছে। সেই সমস্ত শিখর হইতে অসংখ্য জলপ্রপাত দূর হইতে রৌপ্যগুচ্ছের ন্যায় দেখা যাইতেছে, কখন রবিকরে ঝক্‌মক্ করিতেছে, কখন বা অন্ধকারে দৃষ্ট হইতেছে না। ঝরনার জল নিম্নে পড়িয়া কোন স্থানে শৈলনদী-রূপে প্রবাহিত হইতেছে, আবার কোথাও বা চারিদিকে পর্বত থাকার সুন্দর স্বচ্ছ হ্রদের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। তাহার জল পরিষ্কার ও নিষ্কম্প, তাহার উপর চারিদিকের পর্বত-শিখরের ছায়া যেন নিদ্রিত রহিয়াছে।

কখন বা সেনাগণ নিশাকালে পর্বতপথ উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে লাগিল। সে নৈশ পর্বতের শোভা কাহার সাধ্য বর্ণনা করে। দুই দিকে পর্বতচূড়া চন্দ্রকরে সমুজ্জ্বল, কিন্তু দ্বিপ্রহর রজনীতে নিস্তব্ধ ও শান্ত, যেন যোগী পুরুষ পার্থিব সকল প্রবৃত্তি দমন

করিয়া পরিষ্কার আকাশে ললাট উন্নত করিয়া ধ্যানে বসিয়াছেন। সেই শান্ত রজনীতে উভয় দিকের পর্বতের সেইরূপ শোভা দেখিতে দেখিতে মধ্যস্থ পথ দিয়া সৈন্যগণ যাইতে লাগিল।

পর্বতের সহস্র উপত্যকা ও কন্দরে অসভ্য আদিমবাসী ভীলগণ বাস করিতেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও যেরূপ, রাজপুতনায়ও সেইরূপ. আর্যবংশীয়েরা অসিহস্তে আসিয়া কৃষিকার্যোপযোগী সমস্ত দেশ কাড়িয়া লইয়াছে, আদিমবাসীরা পর্বতগুহায় বাস করিতেছে। তাহারা রাজপুতনার রাজাদিগের অধীনতা স্বীকার করে না, তথাপি মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের সময় অনেকে ধনুর্বাণ হস্তে পর্বতে আরোহণ করিয়া রাজপুতদিগের অনেক সহায়তা করিয়াছে।

পর্বত অতিক্রম করিয়া যশোবন্তসিংহ অচিরাৎ আপন মাড়ওয়ার দেশে আসিয়া পড়িলেন। মেওয়ার ও মাড়ওয়ার দুই দেশ দেখিলেই বোধ হয় যেন, প্রকৃতি লীলাক্রমে দুই দেশের বিভিন্নতা সাধন করিয়াছেন। মেওয়ারের যেরূপ পর্বতরাশি ও বিশাল বৃক্ষাদি ও লতাপত্রের গৌরব, মাড়ওয়ারে তাহার বিপরীত। পর্বত নাই, অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ নাই, উর্বরা-ক্ষেত্র নাই, বেগবতী তরঙ্গিনী নাই, পর্বতবেষ্টিত হ্রদ নাই, কেবল মরুভূমিতে বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে ও স্থানে স্থানে অতি ক্ষুদ্রকায় কণ্টকময় বাবুল ও অন্যান্য বৃক্ষ দেখা যাইতেছে। এই মরুভূমির উপর দিয়া সেনাগণ যাইবার সময় মেওয়ারদেশীয় সেনাগণ মাড়ওয়ারী সেনাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—

“আক রা ঝোপ, কোক রা বার,
বাজরা রা রোটি, মোঠ রা সার,
দেখো হো রাজা তেরি মাড়ওয়ার।”

মাড়ওয়ারিগণ সগর্বে উত্তর করিল, “আমাদের জন্মভূমি উর্বরা নহে, কিন্তু বীরপ্রসবিনী বটে।” প্রকৃত মাড়ওয়ারের রাজপুতেরা কঠোর জাতি, রাজপুতানায় তাহাদের অপেক্ষা সাহসী জাতি আর ছিল না।

সৈন্যগণ এইরূপে কয়েকদিন ভ্রমণ করিতে করিতে রাজধানী যোধপুরের সম্মুখে পৌঁছিল ও শিবির সন্নিবেশিত করিল। তখন নরেন্দ্র স্বীয় বন্ধু গজপতির কথা স্মরণ করিয়া একবার রাজার সহিত সাক্ষাত করিতে যাইলেন। রাজা যশোবন্তসিংহ শিবিরে একাকী বিষণ্ণবদনে বসিয়া আছেন, নরেন্দ্র তাঁহার নিকট যাইয়া পৌঁছিলেন।

রাজার আদেশ পাইয়া নরেন্দ্র কহিলেন, "মহারাজ! সিপ্রাতীরে আপনার একজন অনুচর হত হইয়াছেন। পূর্বে একবার মহারাজ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই মুক্তামালা তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তিনিও আপনার দানের অপমান করেন নাই, সম্মুখযুদ্ধে হত হইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে গজপতিসিংহ এ মুক্তামালা আপনার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে আমাকে আদেশ দিয়া গিয়াছেন।"

রাজা সেই মুক্তামালা ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"হা গজপতি! মাড়ওয়ারে তোমা অপেক্ষা সাহসী যোদ্ধা কেহ ছিল না। তোমার পিতা তেজসিংহকে আমি জানিতাম, সূর্যমহল-দুর্গে তাঁহার আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলাম। গজপতি! তুমি আমারই অনুরোধে মাড়ওয়ারে আসিয়াছিলে, বার-বার যুদ্ধে পৈতৃক বিক্রম দেখাইয়াছ। একবার যুদ্ধে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে, সেইজন্য তোমাকে মুক্তামালা দিয়াছিলাম, এবার আপনার জীবন আমার জন্য বিসর্জন দিয়া সেই মালা ফিরাইয়া দিলে। বৎস, নদীর জল একবার যাইলে আর ফিরিয়া আসে না, রাজা একবার দান করিলে আর ফিরিয়া লন না। তোমার বন্ধুর মুক্তামালা, তুমি ললাটে ধারণ করিও এবং যুদ্ধের সময় তাঁহার বীরত্ব যেন তোমার স্মরণ থাকে!"

নরেন্দ্র রাজাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া সেই মালা শিরে ধারণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমার একটি আবেদন আছে। গজপতির দুইটি শিশু-সন্তান আছে, তাহাদের মাতা নাই। গজপতি মহারাজকে বলিয়াছেন, যেন অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের প্রতি

কৃপাদৃষ্টি করেন, যেন কালে শিশু রঘুনাথও রাজাজ্ঞায় পিতার ন্যায় সংগ্রামে জীবন দিতে সক্ষম হয়। ইহা অপেক্ষা অধিক মঙ্গলকামনা তাহার পিতাও জানে না।"

এই করুণ বাক্য শুনিয়া রাজার নয়নে জল আসিল। তিনি বলিলেন, "বৎস, ক্ষান্ত হও, আমি সেই শিশুদের পিতৃস্বরূপ হইব, যোধপুরের রাজ্ঞী স্বয়ং তাহাদের মাতা হইবেন। এখনও রাজ্ঞীকে আমাদের আগমন সংবাদ দেওয়া হয় নাই, আমাদের দূত যাইতেছে। যাও, তুমি স্বয়ং দূতের সঙ্গে যাইয়া রাজ্ঞীর নিকট গজপতির আবেদন জানাও এবং তাহার শিশুদের জন্য দুটি কথাও বলিও।"

রাজার আজ্ঞানুসারে নরেন্দ্র কয়েকজন রাজপুত দূতের সহিত যোধপুর-দুর্গে গমন করিলেন। যোধপুর-দুর্গ যাঁহারা একবার দেখিয়াছেন, তাঁহারা কখনও বিস্মরণ হইতে পারিবেন না। চতুর্দিকে কেবল বালুকারাশি ও মরুভূমি, তাহার মধ্যে একটি উন্নত পর্বত, সেই পর্বতের শিখরের উপর যোধপুর-দুর্গ যেন যোদ্ধার কিরীটের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পর্বত-তলে নগর বিস্তৃত রহিয়াছে এবং নগরের ভিতর দুইটি সুন্দর হ্রদ; পূর্বদিকে রানী-তলাও ও দক্ষিণ দিকে গোলাপ-সাগর। নগরবাসিনী শত শত কামিনী হ্রদ হইতে জল লইতে আসিতেছে, হ্রদের পার্শ্বস্থ সুন্দর উদ্যানে শত শত দাড়িম্ববৃক্ষ ফল ধারণ করিয়াছে ও নাগরিকগণ স্বচ্ছন্দচিত্তে সেই উদ্যানে বিচরণ করিতেছে। নগর নীচে রাখিয়া একদণ্ড ধরিয়া পর্বত আরোহণ করিয়া নরেন্দ্র প্রাসাদে পৌঁছিলেন। রাজ্ঞীর আদেশে দূতগণ ও নরেন্দ্র প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

শ্বেত-প্রস্তর-নির্মিত রাজসিংহাসনে মহারাজ্ঞী বসিয়া আছেন, চারিদিকে সহচরী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ও চামর দুলাইতেছে। রাজ্ঞীর বদনমণ্ডল অবগুণ্ঠনে কিঞ্চিৎ আবৃত হইয়াছে, তথাপি সে নয়নের অগ্নিবৎ উজ্জ্বলতা সম্যক লুক্কায়িত হয় নাই। গরীয়সী বামা যথার্থই রাজমহিষীর ন্যায় সিংহাসনে বসিয়া আছেন, নিবিড় কৃষ্ণকেশে উজ্জ্বল রত্নরাজি ধক্-ধক্ করিতেছে।

দূত প্রণত হইয়া ধীরে ধীরে সভায় সকল সংবাদ জানাইলেন। মহারাজ্ঞী ক্ষণেক নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন, বজ্রপাত ও ঝটিকার পূর্বে আকাশমণ্ডল যেরূপ নিস্পন্দ থাকে, সেইরূপ নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। সহসা অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া আরক্তনয়নে দূতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "কাপুরুষ! সেই সিপ্রানদীতে আপনার অকিঞ্চিৎকর শোণিত বিসর্জন করিতে পার নাই? আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, আর তোমার প্রভু সেই কাপুরুষকে বলিও, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া কলঙ্করাশিতে কলঙ্কিত হইয়াছেন, তিনি আর এ পবিত্র দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।" এই কথা বলিতে বলিতে রাজ্ঞী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

রাজ্ঞীর সহচরীগণ অনেক যত্নে রাজ্ঞীর চৈতন্যসাধন করিল। তখন রাজ্ঞী ক্রোধে প্রায় জ্ঞানশূন্যা হইয়া কহিতে লাগিলেন, "কি বলিল? তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছেন? যিনি পলায়ন করিয়াছেন, তিনি ক্ষত্রিয় নহেন, তিনি আমার স্বামী নহেন, এ নয়ন যশোবন্তসিংহকে আর দেখিবে না। আমি মেওয়ারের রাণার দুহিতা। প্রতাপসিংহের কুলে যিনি বিবাহ করেন, তিনি ভীরু কাপুরুষ কেন হইবেন? যুদ্ধে জয় করিতে পারিলেন না, কেন সম্মুখরণে হত হইলেন না? দূতগণ! এখনও দণ্ডায়মান আছ? আমার যোদ্ধাগণ কোথায়? দূতগণকে পর্বতের উপর হইতে নীচে নিক্ষেপ কর, দ্বার রুদ্ধ কর!"

রাজ্ঞীর সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, ক্রোধে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন নরেন্দ্র অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে অতিশয় গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "মহারাজ্ঞী, আমাদের মৃত্যুর আদেশ দিয়াছেন, আমরা মৃত্যুভয় করি না, কিন্তু মহারাজা যশোবন্তসিংহকে কাপুরুষ বলিবেন না। এই নয়নে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি, যতদিন জীবিত থাকিব, সেরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কখনও দেখিব না, সেরূপ অদ্বিতীয় বীর কখনও দেখিব না।"

রাজ্ঞী ক্ষণেক স্থির-নয়নে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"যথার্থই কি যশোবন্তসিংহ সম্মুখ-যুদ্ধ করিয়াছিলেন? তুমি বিদেশীয়, তোমার জীবনের কোন ভয় নাই, যথার্থ কথা বিস্তার করিয়া বল।"

নরেন্দ্র যুদ্ধের বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করিলেন। রাজপুত-সৈন্যের যেরূপ সাহস দেখিয়াছিলেন, মহারাজের যেরূপ সাহস দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। শেষে বলিলেন, -"যখন মেঘরাশির ন্যায় চারিদিকে মোগল-সেনা আসিয়া বেষ্টন করিল, যখন ধূম ও ধূলায় যুদ্ধক্ষেত্র অন্ধকার হইয়া যাইল, যখন ভীরু কাসেম খাঁ পলায়ন করিল, তখনও মহারাজ রাজপুতের উচিত সাহস অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে রাজপুত-শোণিতে পর্বত, উপত্যকা ও সিপ্রানদী আরক্ত হইয়াছে, রাজার চতুর্দিকে অল্পসংখ্যক মাত্র রাজপুত আছে, আওরংজীব ও মোরাদ সহস্র মোগলসৈন্যের সহিত রাজার উপর আক্রমণ করিতেছেন, তখনও মহারাজ যশোবন্ত সাহস অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজার পদতলে শত শত রাজপুত হত হইতে লাগিল, রাজপুতসংখ্যা ক্ষীণ হইতে লাগিল, মোগলের জয়নাদে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত হইতে লাগিল, কিন্তু মহারাজের হৃদয় কম্পিত হইল না। অষ্ট সহস্র রাজপুতের মধ্যে অষ্ট শতও জীবিত ছিল না, তথাপি মহারাজ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন না। ঘোর-কল্লোলিনী সিপ্রানদী ও ভীষণ বিন্ধ্য-পর্বত রাজা যশোবন্তের বীরত্বের সাক্ষী আছে।"

শুনিতে শুনিতে রাজ্ঞীর নয়নদ্বয় জলে ছল্-ছল্ করিতে লাগিল, তিনি বলিলেন,—"ভগবান্! তোমাকে নমস্কার করি, আমার যশোবন্ত রাজপুতের নাম রাখিয়াছেন। বিদেশীয় দূত, এ কথায় আমার হৃদয় শীতল হইল। বল তাহার পর কি হইল?"

নরেন্দ্র। মানুষের যাহা সাধ্য, রাজপুতের যাহা সাধ্য, যশোবন্ত তাহা করিয়াছেন। যখন কেবলমাত্র পঞ্চ শত সৈন্য জীবিত আছে দেখিলেন, তখন রাজা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন।

রাজ্ঞী। "পলায়ন করিলেন, হা বিধাতঃ! রাণার জামাতা পলায়ন করিলেন!"—বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া রাজ্ঞী পুনরায় মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

তৎক্ষণাৎ দাসীগণ রাজ্ঞীর মুখে জল সিঞ্চন করিতে লাগিল। রাজ্ঞীও অল্পমধ্যেই চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া এবার করুণস্বরে বলিলেন "সহচরি! চিতা প্রস্তুত কর, আমার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইয়াছেন, তিনি স্বর্গধামে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, আমি তথায় যাই! যশোবন্তের নামে যে আসিয়াছে, সে প্রবঞ্চক। আর তুই দূত, তোর সঙ্গীগণের সহিত এইক্ষণেই মাড়ওয়ার দেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হ, নচেৎ প্রাণদণ্ড হইবে।"

নরেন্দ্র ও দূতগণ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, রাজ্ঞীর আজ্ঞায় দুর্গের দ্বার রুদ্ধ হইল। বাহিরে যাইবার সময় যোধপুরের রাজমন্ত্রী দূতের হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন, "মহারাজের সহিত তোমাদের দেখা করিবার আবশ্যকও নাই, এই পত্র লইয়া শীঘ্র মেওয়ার দেশের রাজধানী উদয়পুরে যাও। তথায় রানা রাজসিংহকে এই পত্র দিও, তিনি তোমাদিগকে আশ্রয় দিবেন। আমাদের মহা-রাজ্ঞীর আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, মাড়ওয়ারে আর থাকিতে পাইবে না। মহারাজ্ঞীর মাতা তথায় আছেন, পত্র প্রাপ্তি মাত্র তিনি যোধপুরে আসিবেন, তিনি ভিন্ন তাঁহার কন্যাকে আর কেহ সান্ত্বনা করিতে পারিবেন না।"

ইতিহাসে লিখিত আছে যে, যোধপুরের রাজ্ঞী আট নয় দিবস অবধি উন্মত্তপ্রায় হইয়া রহিলেন। পরে উদয়পুব হইতে তাঁহার মাতা আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলে তখন তিনি যশোবন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যশোবন্ত আওরংজীবের সহিত অচিরাৎ যুদ্ধ করিতে যাইবেন স্থির হইল।

॥ কুড়ি ॥

মেওয়ার দেশে পূর্বে চিতোর প্রধান নগরী ছিল, এক্ষণে উদয়পুর। মাড়ওয়ারের বালুকারাশি ও মরুভূমি হইতে প্রধান-পর্বত মেওয়ার দেশে পুনরায় আসিতে নরেন্দ্রনাথ বড়ই আনন্দানুভব করিলেন। আবার আরাবলার উচ্চ শিখর উল্লঙ্ঘন করিলেন, আবার পার্বতীয় নদী ও প্রস্রবণের বেগ ও মহিমা সন্দর্শন করিলেন, আবার শান্ত নিস্তব্ধ পর্বত হ্রদের শোভা দেখিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে অতুল আনন্দোদয় হইল। কিছুদিন এইরূপে ভ্রমণ করিয়া নরেন্দ্রনাথ ও যোধপুরের দূতগণ উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন।

নরেন্দ্রনাথের বোধ হইল, সেরূপ সুন্দর স্থানে সেরূপ সুন্দর নগরী পূবে তিনি কখনও দেখেন নাই। নীচে সুন্দর শান্ত প্রশস্ত হ্রদ, নির্মল আকাশ ও চতুর্দিকস্থ পর্বতশ্রেণীর ছায়া সযত্নে বক্ষে ধারণ করিতেছে। চতুর্দিকে সুন্দর পর্বতরাশির পর পর্বতরাশি, যেন প্রকৃতি এই মনোহর উচ্চ প্রাচীর দিয়া এই সুখের আবাসস্থানকে রক্ষা করিতেছে। হ্রদের নিকটবর্তী একটি পর্বতশ্রেণীর উপর সুন্দর রাজপ্রাসাদ ও শ্বেতবর্ণ সৌধমালা যেন সহাস্যবদনে নিম্ন দর্পণে আপনার সুন্দর প্রতিরূপ অবলোকন করিতেছে।

সূর্যদ্বার দিয়া যোধপুরের দূত নগরে প্রবেশ করিলেন। যোধপুর ও উদয়পুরে তখন বন্ধুত্ব ছিল, সুতরাং যোধপুরের দূতগণকে আহ্বান করিবার জন্য নাগরিকগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। প্রশস্ত পথ দিয়া নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহাব সঙ্গিগণ রাজপ্রাসাদাভিমুখে যাইতে লাগিলেন, চারণগণ "টপ্পা" অর্থাৎ মঙ্গলসূচক গীত গাইতে লাগিলেন, দুই পার্শ্বে স্ত্রীলোকগণ কলসকক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া "সুহেলিয়া" অর্থাৎ আনন্দগীত গাইয়া যোধপুরের দূতদিগকে আহ্বান করিলেন। দূতগণ সকলকেই দুই-এক মুদ্রা পুরস্কার দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।

অনন্তর সকলে রাজপ্রাসাদে পৌঁছিয়া রাণার অনুমতিক্রমে প্রাসাদের উপর উঠিলেন, শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিত সোপান দ্বারা আরোহণ করিয়া সূর্যমহলে প্রবেশ করিলেন। সেই মহলেই রাণা বিদেশীয় দূতদিগকে আহ্বান করিতেন। বংশের আদিপুরুষ সূর্যের একটি প্রতিমূর্তি সেই গৃহের এক দেওয়ালে খোদিত ছিল, সেইজন্য উক্ত মহলের নাম সূর্যমহল।

রক্তবর্ণ বস্ত্রমণ্ডিত বহুমূল্য রত্ন-বিনির্মিত রাজাসনে বাপ্পারাওয়ের বংশাবতংস মহারাণা রাজসিংহ উপবেশন করিয়া আছেন। চারিদিকে সুবর্ণখচিত রৌপ্যস্তম্ভের উপর একটি চন্দ্রতাপ মণিমুক্তায় ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। কিঞ্চিৎ দূরে পারিষদ্‌গণ উপবেশন করিয়া আছেন ও চারণগণ স্তুতিবাক্যে এই অমরাবতী তুল্য রাজসভায় রাণার সাধুবাদ করিতেছেন। এরূপ সময়ে যোধপুরের দূত প্রবেশ করিলেন।

দূত বিনীতভাবে সমস্ত সমাচার অবগত করাইলেন। যশোবন্ত-সিংহের পরাজয় ও দেশে প্রত্যাগমন, মহারাজ্ঞীর ক্রোধ ও রাজার দুর্দশা এই সমস্ত অবগত করাইয়া যোধপুরের মন্ত্রীর পত্র রাণার হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাণা রাজসিংহ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া যশোবন্তের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া দূতগণকে বিদায় করিলেন ও তাঁহাদের উদয়পুরে থাকিবার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারিত করিতে মন্ত্রিবরকে আদেশ করিলেন। অল্পদিন পরেই যোধপুর-রাজ্ঞীর মাতা উদয়পুর হইতে যোধপুরে গমন করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ উদয়পুরে কয়েকমাস বাস করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। হেমের প্রতিমূর্তি তাঁহার হৃদয়ে অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত হইয়াছিল, হেমের চিন্তা তিরোহিত হইবার নহে, তথাপি সেই সুন্দর উপত্যকায় বাসকালীন সে চিন্তাও কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব হইল, উদয়পুর হইতে অল্পদূরে অনেক যুদ্ধস্থান, অনেক কীর্তিস্তম্ভ, অনেক পূজ্যস্থান আছে, নরেন্দ্র একে একে সমুদয় সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। কখন একাকী, কখন দেওয়ানা তাতার-বালককে

সঙ্গে লইয়া নরেন্দ্র নানা পর্বত উল্লঙ্ঘন করিতেন, হ্রদের এক এক অংশ হইতে অন্য অংশে, এক পর্বত হইতে অন্য পর্বতে, এক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন; কখন কখন প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত, দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পর্বত ও উপত্যকায় বিচরণ করিতেন। প্রাতঃকালে ক্রীড়াসক্ত রাজপুত বালকগণ অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক সেই অপরিচিত ভ্রমণকারীকে দেখাইত, সায়ংকালে রাজপুত মহিলাগণ কলসকক্ষে হ্রদ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় সেই বিদেশীকে চারণ বিবেচনায় প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইত।

দেওয়ানাও নিস্তব্ধ প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিত, নিকটস্থ বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া আনিয়া দিত ও সায়ংকালে নৌকা আনিয়া আপনি দাঁড় ধরিয়া প্রভুকে উদয়পুরে পুনরায় লইয়া যাইত। নিস্তব্ধ শান্ত হ্রদের উপর দিয়া ধীরে ধীরে নৌকা ভাসিয়া যাইত। সে শান্ত সায়ংকালীন আকাশ, নিস্তব্ধ পর্বতরাশি ও নির্মল শব্দশূন্য হ্রদ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের হৃদয় শান্তিরসে পরিপূর্ণ হইত। কখনও বা দেওয়ানা সপ্তস্বরে গীত আরম্ভ করিত, সে বালককণ্ঠ-বিনিঃসৃত সুবিমল স্বরে সেই নৈশ হ্রদ, পর্বতরাশি ও আকাশমণ্ডল ভাসিয়া যাইত। তাতার ভাষায় গীত, সে গান নরেন্দ্র বুঝিতে পারিতেন না। তথাপি দুই একটি কথা শুনিয়া বোধ হইত যেন তাহা প্রেমের গান। অভাগা উন্মত্ত বালক! তুই এই বয়সে কি প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিস? না হইলে সে দেওয়ানা হইবে কেন. তাহার চক্ষু এরূপ অস্বাভাবিক জ্যোতিতে দীপ্ত কেন, সে দেশ, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, উন্মত্ত হইয়া দেশে দেশে বিচরণ করে কেন? দেওয়ানা নরেন্দ্রনাথের উপযুক্ত ভৃত্য।

রজনীর চন্দ্রালোকে সেই হ্রদের নির্মল জল বড় সুন্দর শোভা পাইত। জলহিল্লোলে চন্দ্রের আলোক বড় সুন্দর নৃত্য করিত, বায়ু রহিয়া রহিয়া সেই সুন্দর ঊর্মিমালাকে চুম্বন করিয়া যাইত। নরেন্দ্রনাথ নৌকার উপর শায়িত হইয়া চারিদিকে সেই অনন্ত

পর্বতরাশি দেখিতেন, অনন্ত আকাশে নির্মল নীল আভা দেখিতেন, দুই একখানি দুগ্ধফেননিভ শুভ্র মেঘ দেখিতেন। এই সমস্ত দেখিতেন, আর বাল্যকালের কথা স্মরণ হইত, হেমলতার কথা স্মরণ হইত, অলক্ষিত অশ্রুবিন্দুতে যোদ্ধার বদন সিক্ত হইয়া যাইত।

এইরূপ কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। ক্রমে আশ্বিন মাসে অম্বিকাপূজার সময় সমাগত হইল।

॥ একুশ ॥

শরৎকাল উপস্থিত। রাজপুতনায় এই সময় যুদ্ধ আরম্ভের সময়, সুতরাং রাজস্থানে অম্বিকার পূজার সহিত খড়্গের পূজা হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসে উপর্যুপরি দশদিন নরেন্দ্রনাথ যেরূপ ঘটা ও সমারোহ দেখিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। পূর্বপুরুষগণ যে সমস্ত অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ জয় করিয়াছেন বা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন, যোদ্ধৃগণ এখন মহা উৎসাহে সেই সমস্ত অস্ত্র আয়ুধশালা হইতে বাহির করিয়া মহাসমারোহের সহিত তাহার পূজায় রত হইলেন। দেবীর মন্দিরে প্রতিদিন মহিষ ও মেষ বলি হইল, দশম দিবসে মহাসমারোহে দুর্গার পূজা হইল, তাহার পর-দিবসে মহারাণা সমস্ত যোদ্ধৃগণকে আহ্বান করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। সেদিন সমস্ত উদয়পুর যেন নূতন শোভায় শোভিত হইয়াছে। বাজার, দোকান, পথ-ঘাট পুষ্পমাল্য ও বৃক্ষপত্রে পরিশোভিত হইয়াছে; দ্বারে দ্বারে সুন্দর ও সুশোভিত তোরণ দৃষ্ট হইতেছে; গৃহে গৃহে বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইতেছে। প্রাতঃকালে জয়ঢাকের শব্দে রাজপুত সৈন্যগণ সজ্জিত হইয়া রঙ্গস্থলে গমন করিতেছে, উদয়পুরের অধীনস্থ নানা স্থান হইতে অনেক সেনানী নিজ নিজ সৈন্যসামন্ত লইয়া সমবেত হইয়াছে, নানা স্থানীয় লোকের নানারূপ পরিচ্ছদ, নানারূপ পতাকা ও নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র আজি উদয়পুরে সম্মিলিত হইতেছে। পঞ্চদশ সহস্র যোদ্ধা আজি মহারাণাকে বেষ্টন করিয়াছে, তাহাদিগের পদভরে যেন মেদিনী কম্পিত হইতেছে।

বেলা একপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত রণস্থল সৈন্যে সমাকীর্ণ এবং তাহাদিগের যুদ্ধকৌশল দেখিবার জন্য সমস্ত নগরবাসী ঝাঁপিয়া পড়িয়াছে। রাণার আদেশে সৈন্যগণ তীরনিক্ষেপ বা বর্শাচালনে, খড়্গাযুদ্ধে অথবা অশ্বচালনে নিজ নিজ কৌশল দেখাইতে লাগিল এবং মেওয়ারের নানা স্থান ও নানা দুর্গ হইতে আগত নানা কুলের রাজপুতগণ নিজ নিজ রণনৈপুণ্য দর্শাইতে লাগিল। চন্দাওয়াৎকুল, জগাওয়াৎকুল, রাঠোরকুল, প্রমরকুল, ঝালাকুল প্রভৃতি নানা কুলের রাজপুতগণ অদ্য উদয়পুরে মহারাণার নিকট রাজভক্তি ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে আসিয়াছে এবং তাহাদিগের স্ব-স্ব চারণগণ সেই সেই কুলের গৌরবসূচক গীত গাইতেছে। নরেন্দ্র সমস্তদিন এইরূপ সমরোৎসব দেখিয়া এবং চারণদিগের গীত শুনিয়া পুলকিত হইলেন। অদ্যাবধি রাজস্থানে শারদীয়া পূজার শেষ দিনে এইরূপ ঘটা হয়, অদ্যাবধি রাজপুত যোদ্ধৃগণ এই সময়ে নিজ নিজ রাজার নিকট সমবেত হইয়া যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করে, অদ্যাবধি রাজপুত নগর-বাসিগণ দেবীপূজার অবসানে রণস্থলে সমবেত হইয়া দেশীয় রাজাকে রাজভক্তি প্রদর্শন করে। বর্তমান লেখক রাজস্থানে ভ্রমণকালীন শারদীয় খড়্গাপূজা ও শারদীয়া সমারোহ অবলোকন করিয়াছে, সহস্র সহস্র নগরবাসীদিগের সমাগম ও রাজভক্তি দৃষ্টি করিয়াছে, প্রাচীন নিয়ম অনুসারে স্বাধীন রাজপুতদিগের শরৎকালের আনন্দোৎসব দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিয়াছে।

সমস্তদিন এইরূপ উৎসব দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ সন্ধ্যার সময় একটি বৃক্ষতলে যাইয়া কিছু ফলমূল আহারের আয়োজন করিলেন এবং নিকটস্থ একটি কূপ হইতে জল আনিতে গেলেন। কূপের নিকট গোস্বামীবেশে একব্যক্তি দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনিও জল আনিতে গিয়াছিলেন। তিনি নরেন্দ্রকে কিঞ্চিৎ পুরুষ ভাবে ঠেলিয়া দিয়া আগে নিজে জল তুলিতে লাগিলেন।

গোস্বামীর এই অভদ্রাচরণ দেখিয়া নরেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিরস্কার করিলেন। গোস্বামী দ্বিগুণ কটুভাষায় তিরস্কার করিয়া

বলিলেন,—"তুমি বিদেশীয়, রাজস্থানে আসিয়া রাজপুতদিগের সহিত কলহ করিতে তোমার ভয় বোধ হয় না?"

নরেন্দ্র। আমি বিদেশীয় বটে, কিন্তু বহুকাল অবধি রাজপুতদিগের সহিত সহবাস করিয়াছি; তোমার ন্যায় অভদ্র রাজপুত দেখি নাই।

গোস্বামী। যদি রাজপুতদিগের সহিত সহবাস করিয়া থাক তাহা হইলে বোধ হয় জান যে রাজপুতমাত্রেই অসি ও ঢাল চালাইতে জানে; অতএব চুপ করিয়া থাক।

নরেন্দ্র। গর্বিত রাজপুত, আমিও অসি ও ঢাল চালনা কিছু শিক্ষা করিয়াছি, আমার নিকট গর্ব করিও না। তুমি গোস্বামী বলিয়া এবার ক্ষমা করিলাম।

কথায় কথায় বিবাদ বাড়িতে লাগিল, গোস্বামী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নরেন্দ্রকে প্রহার করিলেন, নরেন্দ্রও প্রহার করিলেন, অল্পক্ষণে উভয়েই জ্ঞানশূন্য হইয়া অসি ঢাল বাহির করিলেন। তখন অন্ধকার হইয়াছে, সেস্থান নির্জন, আর সকলে চলিয়া গিয়াছে।

দুইজনে একেবারে বেগে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, ক্ষণকাল তাঁহাদের কাহাকেও ভাল করিয়া দেখা গেল না। মুহূর্তমধ্যে নরেন্দ্র পরাজিত হইলেন। সেই অপূর্ব বলবান গোস্বামীর প্রচণ্ড আঘাতে নরেন্দ্রের ঢাল চূর্ণ হইয়া গেল, নরেন্দ্রের অসি হস্ত হইতে পড়িয়া গেল, নরেন্দ্র স্বয়ং ভূমিতে নিপতিত হইলেন।

তীব্রস্বরে গোস্বামী বলিলেন,—"বিদেশীয় যোদ্ধা! তুমি বালক, তোমার অপরাধ ক্ষমা করিলাম। পুনরায় রাজপুত গোস্বামীর সহিত কলহ করিও না, গোস্বামীর চিরজীবন কেবল পূজাকার্যে আতবাহিত হয় নাই, সে-ও যুদ্ধ-ব্যবসার কিছু কিছু জানে।"

নরেন্দ্র কর্কশস্বরে বলিলেন,—"রাজপুত! আমি তোমার নিকট জীবন-ভিক্ষা চাহি না। তোমার যাহা ইচ্ছা, যাহা সাধ্য কর, আমি অনুগ্রহ চাহি না।"

গোস্বামী তখন গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—"যোদ্ধা, আমিও

যুদ্ধ-ব্যবসায় করিয়া থাকি, যোদ্ধার নিকট ভিক্ষা করিতে যোদ্ধার কোন অপমান নাই। নরেন্দ্র, আমি তোমাকে জানি, তুমিও আমাকে শীঘ্র জানিবে, আমার নিকট একটি ভিক্ষা গ্রহণ করিতে কোনও অপমান নাই। তিন দিবসের মধ্যে আমাদের আবার সাক্ষাৎ হইবে, সেদিন আমিও তোমার নিকট একটি ভিক্ষা প্রার্থনা করিব। আমার নাম শৈলেশ্বর।”

এই বলিয়া গোস্বামী সহসা অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন। নরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

॥ বাইশ ॥

রাজস্থানে নূতন নূতন দেশ ও নূতন নূতন আচার-ব্যবহার দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের হৃদয় কিছুদিন শান্ত হইয়াছিল, কিন্তু প্রস্তরে যে অঙ্ক খোদিত হয় তাহা একেবার বিলুপ্ত হয় না। বঙ্গদেশ হইতে উদয়পুর শত শত ক্রোশ অন্তর, কত নদ-নদী, পর্বত, মরুভূমি পার হইয়া নরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্যন্ত আসিয়াছেন। তথাপি প্রাতঃকালে যখন পূর্বদিকের আকাশে রক্তিমচ্ছটা অবলোকন করিতেন, তখন সেই পূর্বদেশ-বাসিনী বালিকা নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে জাগরিত হইত। রজনীতে যখন নরেন্দ্রনাথ একাকী ছাদের উপর অন্ধকারে বিচরণ করিতেন, বোধ হইত যেন, সেই প্রণয়প্রতিমা তাহার জ্যোতিতে নরেন্দ্রনাথের উপর প্রেমদৃষ্টি করিতেছে। কোথায় বীরনগরের বাটি, কোথায় কলনাদিনী ভাগীরথী, আর কোথায় নরেন্দ্রনাথ? কিন্তু স্বদেশ হইতে পলায়ন করিলে কি চিন্তা হইতে পলায়ন করা যায়? মৃত্যুর আগে আর একবার সেই হেমলতাকে দেখিবেন, প্রাতঃকালে, সায়ংকালে, নিশীথে তিনি যে চিন্তা করেন, হেমলতাকে একবার সেই সমস্ত কথা বলিবেন, নরেন্দ্রনাথের কেবল এই ইচ্ছা। মৃত্যুর আগে কি আর একবার দেখা হইবে না? নরেন্দ্রনাথ দেওয়ানের

নিকট শুনিলেন, ভগবান একলিঙ্গের মন্দিরের কোন এক গোস্বামী ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন; নরেন্দ্রনাথ একদিন সেই মন্দিরে যাত্রা করিলেন।

রজনী এক প্রহরের পর নরেন্দ্র মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলেন, মন্দিরের যে শোভা দেখিলেন, তাহাতে তিনি বিস্মিত হইলেন। মন্দির একটি উপত্যকায় নির্মিত, তাহার চারিদিকে যতদূর দেখা যায়, কেবল অন্ধকারময় পর্বতরাশি অন্ধকার আকাশের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, চারিদিকে যেন প্রকৃতি অলজ্ঘনীয় প্রাচীর দিয়া রুদ্রের উপযুক্ত গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় নরেন্দ্র সেই প্রকাণ্ড মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সারি-সারি শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্মিত সুন্দর স্তম্ভের মধ্য দিয়া সেই বিস্তীর্ণ প্রস্তরালয়ে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে মহাদেবের যণ্ড ও নন্দী পিত্তল প্রতিমূর্তি রহিয়াছে, ভিতরে শুভ্র-প্রকোষ্ঠ ও স্তম্ভসারি উজ্জ্বল সুগন্ধ দীপাবলীতে ঝলমল্ করিতেছে, মধ্যে ভোলানাথের প্রস্তর বিনির্মিত প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মন্দিরের একজন দীর্ঘকায় তেজস্বী জটাধরী গোস্বামী এক-প্রান্তে উপবেশন করিয়া আছেন, প্রশস্ত ললাটে অর্ধ-শশাঙ্কের ন্যায় চন্দনরেখা, বিশাল স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। অন্য দুই-চারি জন গোস্বামী এদিক ওদিক বিচরণ করিতেছেন। ঐ মন্দিরের প্রধান গোস্বামী চিরকাল অবিবাহিত থাকেন, তাঁহার মৃত্যুর পর শিষ্যের মধ্যে একজন ঐ পদে নিযুক্ত হন। মন্দিরের সাহায্যার্থে অনেক-সংখ্যক গ্রাম নির্দিষ্ট ছিল, তাহা ভিন্ন যাত্রীদিগের দানও অল্প ছিল না।

দ্বিপ্রহরের ঘন্টারব সেই সুন্দর শিবমন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইল, বম্ বম্ হর হর শব্দে মন্দির পরিপূরিত হইল ও তৎপরে যন্ত্র সম্মিলিত উচ্চ গীতধ্বনিতে ভোলানাথের স্তব আরম্ভ হইল। প্রৌঢ়যৌবনসম্পন্না নর্তকীগণ তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল, গায়কগণ সপ্তস্বরে মহাদেবের অনন্ত গীত গাইতে আরম্ভ করিল।

ক্ষণেক পরে গীত সাঙ্গ হইল, সেই জটাধারী গোস্বামী ইঙ্গিত করায় নর্তকীগণ চলিয়া গেল, গায়কগণ নিস্তব্ধ হইল, দীপাবলী নির্বাপিত হইল, পূজা সাঙ্গ হইল। নরেন্দ্রনাথ সে অন্ধকারে ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।

ক্ষণেক পর বোধ হইল, যেন অন্ধকারে সেই দীর্ঘকায় জটাধারী গোস্বামী তাঁহাকে ইঙ্গিত করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ সেইদিকে যাইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় কি এ মন্দিরের একজন গোস্বামী?" গোস্বামী কিছুমাত্র না বলিয়া ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। তৎপরে গোস্বামী অঙ্গুলি দ্বারা দূরে এক দিক্ নির্দেশ করিলেন, নরেন্দ্র সেইদিকে চাহিলেন; নিবিড় দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আবার চাহিলেন, বোধ হইল, যেন অন্ধকারে একটি দীপশিখা দেখা যাইতেছে। গোস্বামী নরেন্দ্রনাথকে ইঙ্গিত করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন, নরেন্দ্রনাথ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

দুইজনে অনেক পথ সেই অন্ধকারে অতিবাহিত করিলেন। এ অন্ধকারে এই মৌনাবলম্বী যোগীপুরুষ কে? ইহার উদ্দেশ্য কি? শৈবগণ কখন কখন নরহত্যার দ্বারা পূজাসাধন করে, এ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ বিকট যোগীর কি তাহাই উদ্দেশ্য? একবার নরেন্দ্রনাথ দাঁড়াইলেন, আবার খড়্গে হাত দিয়া ভাবিলেন, "আমি কি কাপুরুষ? এই প্রশান্তমূর্তি যোগীর সহিত যাইতে ভয় করিতেছি?" আবার গোস্বামীর সঙ্গে সঙ্গে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর শৈব গোস্বামী এক পর্বতগহ্বরে প্রবেশ করিলেন। তাহার ভিতর যাহা দেখিলেন, তাহাতে নরেন্দ্র আরও বিস্মিত হইলেন। সম্মুখে করালবদনা কালীর ভীষণ প্রতিমূর্তি, তাহার নিকট কয়েকখানি কাষ্ঠ জ্বলিতেছে, তাহার আলোক সেই গহ্বরের শিলায় চারিদিকে প্রতিহত হইতেছে। অগ্নির পার্শ্বে কয়েকখানি হস্তলিপি, একখানি শোণিতাক্ত খড়্গ ও স্থানে স্থানে প্রস্তরখণ্ড

শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে। দূরাগত-জল-স্রোতের ন্যায় একটি শব্দ সেই গহ্বরে শ্রুত হইতেছিল।

গোস্বামীর আকৃতি অপূর্ব। ঈষৎ শ্বেত শ্মশ্রু বক্ষঃস্থল পর্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে, কেশের জটাভার পৃষ্ঠে দুলিতেছে, শরীর অতিশয় দীর্ঘ, অতিশয় বলিষ্ঠ, অতিশয় তেজোময় বলিয়া অনুভব হয়। নয়নদ্বয় সেই অগ্নির আলোকে ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। উন্নত ললাটে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দনরেখা শোভা পাইতেছে।

গোস্বামী জ্বলন্ত কাষ্ঠ নির্বাণ করিলেন পরে তাহার অপর পার্শ্বে যাইয়া সেই রক্তাক্ত খড়্গ হস্তে তুলিয়া লইলেন। বিকিরণ অগ্নিকণাতে তাঁহার মুখমণ্ডল ও দীর্ঘ অবয়ব আরও বিকট বোধ হইল, নরেন্দ্রনাথের হৃদয় স্তম্ভিত হইল। তিনি অগত্যা এক পদ পশ্চাতে যাইয়া শিলারাশিতে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইলেন, অগত্যা তিনি কোষ হইতে অসি বাহির করিলেন। সাহসে ভর করিয়া তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাঁহার হৃৎকম্প একেবারে অবসান হইল না।

অতি গম্ভীরস্বরে গোস্বামী ডাকিলেন, “নরেন্দ্রনাথ?”

নরেন্দ্রনাথ এতক্ষণে বুঝিলেন, শৈব সেই উদয়পুরের যোদ্ধা— শৈলেশ্বর।

॥ তেইশ ॥

শৈলেশ্বর। নরেন্দ্রনাথ। ভগবান একলিঙ্গের মন্দিরের গোস্বামীগণ যোগবলে মানব-হৃদয় জানিতে পারেন। নরেন্দ্রনাথ। তুমি পাপ-হৃদয়ে এ পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছ। তোমার মনে পাপচিন্তা আছে।

নরেন্দ্র। আপনি কে জানি না, আপনার কথায় উত্তর দিতে বাধ্য নহি।

শৈলেশ্বর। আমি ভগবান একলিঙ্গের মন্দিরের গোস্বামী, মন্দির-কলুষিতকারীকে প্রশ্ন করিবার আমার অধিকার আছে।

নরেন্দ্র। আপনি আমাকে কিরূপে চিনিলেন, জানি না ; আপনি আমার কি পাপ দেখিয়াছেন, জানি না।

শৈলেশ্বর। এ মন্দিরে প্রতারণা অনাবশ্যক। একটা রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সেই নারীকে পুনরায় পাইবার লালসায় তুমি এইস্থানে আসিয়াছ।

নরেন্দ্র। যদি তাহাই হয়, তাহাতে পাপ কি? গোস্বামীগণ যদিও রমণীপ্রেমে বঞ্চিত, তথাপি রমণীপ্রেম আকাঙ্ক্ষা, পাপ নহে। স্বয়ং শূলপাণি অর্পণার প্রেম আকাঙ্ক্ষা করেন।

শৈলেশ্বর। নরেন্দ্র! এ প্রবঞ্চনার স্থান নহে। তুমি কেবল রমণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী নহ, তুমি পরস্ত্রীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী! জগতে এরূপ যন্ত্রণা কি আছে, নরকে এরূপ অগ্নি কি আছে, যাহাতে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়?

নরেন্দ্র। আমি যখন একটি বালিকাকে ভালবাসিতাম, তখন সে অবিবাহিতা ছিল। এক্ষণে যদি সে বিবাহিতা হইয়া থাকে, তবে সে আমার অস্পৃশ্যা।

শৈলেশ্বর। নরেন্দ্রনাথ! আপনাকে ভুলাইও না, আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। যে ঘোর পাপে লিপ্ত হইয়াছ, তাহা বিশেষ করিয়া আলোচনা কর, সুন্দর জাহ্নবীকূলে সেই সুন্দর অট্টালিকা স্মরণ কর। পবিত্রাত্মা শ্রীশচন্দ্র, পবিত্রহৃদয়া হেমলতা, পবিত্র সংসার! পাপিষ্ঠ, তোমার মনোরথ কি? সেই সংসার ছারখার হয়, সেই শ্রীশচন্দ্রের সর্বনাশ হয়, সেই হেমলতা তোমার হয়। সেই শ্বেতপদ্মসন্নিভা পুণ্যহৃদয়া হেমলতা বাল্যকালে যে তোমার সহিত খেলা করিয়াছিল. এখনও সহোদরা অপেক্ষা তোমাকে যে স্নেহ করে, তোমার জন্য চিন্তা করে, সেই স্নেহময়ী পতিব্রতা নারী কুলটা হইয়া তোমাকে সেবা করে? সতীর ললাটে কুলকলঙ্কিনী দুশ্চারিণী শব্দ অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত হয়? তাহার দুগ্ধফেননিভ শ্বেত অঙ্গে অঙ্গারবর্ণ দেদীপ্যমান হয়? তোমার জন্য সে সংসার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়? হা নরেন্দ্রনাথ! আপনাকে ভুলাইও না। সত্য

তুমি এতদূর ভাব নাই, কিন্তু তোমার মনোরথ পূর্ণ হইলে ইহা ভিন্ন আর কি ফল হয়? এই পাপ মনোরথে তুমি এই পবিত্র মন্দিরে আসিয়াছ।

শৈলেশ্বরের কথা সাঙ্গ হইল, কিন্তু সে বজ্রধ্বনি তখনও নরেন্দ্রের কর্ণমূলে কম্পিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ অধোবদনে রহিলেন, তাঁহার শরীর কম্পিত হইতেছিল। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার ক্রোধ লীন হইল, নয়ন হইতে দুই একটি অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইল। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"স্বামিন্! আমি পাপিষ্ঠ। আমাকে সমুচিত দণ্ডবিধান করুন।"

শৈলেশ্বর। বৎস! এ সংসারে এরূপ ব্যাধি নাই, যাহার ঔষধি নাই; এরূপ পাপ নাই, যাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি তোমার সংশোধন কামনা করি, দণ্ডবিধান কামনা করি না।

নরেন্দ্র। স্বামিন্! আমি দয়ার উপযুক্ত নহি; যে পাপিষ্ঠ হেমলতার ন্যায় পবিত্র-পুত্তলীর অপকার কামনা করে, তাহার ইহজীবনে প্রায়শ্চিত্ত নাই।

শৈলেশ্বর। নরেন্দ্র, তুমি আপনাকে যতদূর পাপী বিবেচনা করিতেছ ততদূর পাপী নহ। আমার নিকট কিছুই অবিদিত নাই। তুমি হেমলতাকে পাইবার আর মানস কর নাই, জীবনে আর একবার তাহাকে দেখিবে, এইরূপ মানস প্রকাশ করিয়াছিলে, সেই মানসেই দেবালয়ে আসিয়াছিলে। কিন্তু তুমি বালক, জান না, হেমলতাকে আর একবার দেখিলে তাহার সর্বনাশসাধন হইবে।

নরেন্দ্র। প্রভো' আপনি যাহা আদেশ করিলেন যথার্থ, হেমলতার হানি করা দূরে থাক, তাহার শরীরের একটি কণ্টক বিমোচন করিবার জন্য আমি জীবন দিতে পারি, ভগবান অন্তর্যামী, তিনি তাহা জানেন।

শৈলেশ্বর। তবে তাহার যে হৃদয়ে কণ্টকটি তুমিই স্থাপন করিয়াছ, সেই কণ্টকটি তুলিতে যত্নবান হও না কেন?

নরেন্দ্র। কিরূপে? আদেশ করুন।

শৈলেশ্বর। বাল্যকালাবধি তুমি তাহার হৃদয়ে প্রেমস্বরূপ কণ্টক রোপণ করিয়াছ, সেটি তুমি উৎপাটন কর, না হইলে তাহা উৎপাটিত হইবে না, হেমলতা জীবন্মৃতা থাকিবে। হেমলতা এক্ষণে সচ্চরিত্র ধর্মপরায়ণ স্বামী পাইয়াছে, সংসারকার্যে ব্রতী হইয়াছে, কেবল সময়ে সময়ে তোমার চিন্তা তাহার মনে উদয় হয়, কেবল সেই সময়ে স্বামীর প্রতি হৃদয়ে বিশ্বাসঘাতিনী হয়। সেই চিন্তা তুমি দূর কর।

নরেন্দ্র। কিরূপে দূর করিব? আপনি বলিতেছেন, তাহার সহিত দেখা করিলে তাহার সর্বনাশ হইবে।

শৈলেশ্বর। উপায় আছে। হেমলতার সহিত একেবারে চির-জন্মের মত বিচ্ছেদ ঘটান আবশ্যক। নরেন্দ্র, তুমি যদি যথার্থ হেমলতাকে ভালবাস, যদি যথার্থ তাহার কণ্টকোদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতে সম্মত থাক, তবে যোগী হইয়া নারী-সংসর্গ ত্যাগ কর কিংবা মুসলমান হইয়া মুসলমান-কন্যা বিবাহ কর। হেম যখন শুনিবে যে, নরেন্দ্র আমার বাল্যকালের ভালবাসা ভুলিয়া যোগী হইয়াছে, অথবা বিধর্মী হইয়া অন্য স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়াছে, তখন অবশ্যই তাহার হৃদয় ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইবে। মানব-হৃদয় লতার মত শুষ্ককাষ্ঠে জড়াইয়া থাকে না। সে বুঝিবে যে, যে তাহাকে একবার বিস্মিত হইয়াছে, যাহার অন্য আশা, অন্য প্রেম, অন্য উদ্দেশ্য, অন্য চিন্তা, তাহার প্রতি অনুরক্তি কখনও চিরকাল থাকে না। নরেন্দ্র! তোমার বিষম পাপের এই বিষম প্রায়শ্চিত্ত!

নরেন্দ্র। ভগবান জানেন, আমি তাহার জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু আপনি যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহা অসহ্য। স্বামিন্! ঐ ঔষধ অতিশয় তিক্ত, অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করুন।

শৈলেশ্বর। উৎকট রোগে উৎকট ঔষধ আবশ্যক।

নরেন্দ্র   স্বামিন্! আপনি পরম ধার্মিক শৈব হইয়া আমাকে মুসলমান-ধর্ম অবলম্বন করিবার আদেশ করিতেছেন ?

শৈলেশ্বর। পাপের জন্য মনুষ্য গো-জন্ম পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়, কেবল জাতিনাশে ভীত হইতেছ ?

দুইজনে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। নরেন্দ্রনাথ হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দিকে চাহিয়া একমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, শৈলেশ্বর সেই পর্বতগহ্বরে ধীরে ধীরে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে শৈলেশ্বর গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"নরেন্দ্রনাথ, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর ?"

নরেন্দ্র। আমার খড়্গ গ্রহণ করুন, আর কি প্রমাণ দিব ?

শৈলেশ্বর। তবে একটি কথা শুন। প্রেম নারীর একমাত্র অবলম্বন, প্রেম নারীর জীবন; পুরুষের তাহা নহে। পুরুষের অনেক আশা, অনেক অভিলাষ, অনেক মহৎ উদ্দেশ্য আছে। তুমি যুবক, সাহসী, অভিমানী, এ প্রশস্ত জগতে কি আপন অসি সহায় করিয়া আপনার যশের পথ পরিষ্কার করিতে পার না ? স্ত্রীলোকের মত কি কেবল ক্রন্দন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে চাও ? শুনিয়াছি, তোমাদের বঙ্গদেশ বীরশূন্য—যশশূন্য। যাও, নরেন্দ্রনাথ। সেই দূর বঙ্গদেশে যশস্তম্ভ স্থাপন কর, যাও দেশের গৌরবসাধন কর, সিংহবীর্য প্রকাশ করিয়া আপন কীর্তি স্থাপন কর; এ মহৎ উদ্দেশ্যে তোমার জীবন সমর্পণ কর। আকাশে এরূপ দেবতা নাই; যিনি এ মহৎ উদ্দেশ্যে তোমার সহায়তা না করিবেন; স্বয়ং বজ্রপাণি পুরন্দর, স্বয়ং শূলপাণি মহাদেব তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন।

শৈলেশ্বর নিস্তব্ধ হইলেন। নরেন্দ্রের নয়নদ্বয় জ্বলিতে লাগিল। তিনি একদৃষ্টিতে সেই অপূর্ব শৈবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পূর্বে একদিন এই শৈবকে যেরূপ যুদ্ধনিপুণ দেখিয়াছিলেন অদ্য মানব-হৃদয়জ্ঞানে তাঁহাকে সেইরূপ নিপুণ দেখিলেন।

শৈব আবার বলিতে লাগিলেন, "নরেন্দ্র! এই ঘোর রজনীতে তুমি বিদেশে ভগবান একলিঙ্গের মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়াছ কি জন্য? দেশের হিতসাধনের জন্য আসিয়াছ? কোন্ বীরব্রতে ব্রতী হইয়া আসিয়াছ? কোন্ দেবোচিত মহদুদ্দেশ্যসাধনার্থে আসিয়াছ? ধিক্ নরেন্দ্র! তোমার ন্যায় বীরপুরুষ একটি বালিকার মুখ দেখিবার জন্য জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ভুলিয়া থাকে? প্রেমচিন্তা দূর কর; অথবা যদি প্রেম বিনা জীবন শুষ্ক বোধ হয়. তবে বীরোচিত প্রণয়ে বদ্ধ হও। পুরুষসিংহ। সিংহী গ্রহণ কর।

নরেন্দ্র। ভগবান! আদেশ করুন।

শৈলেশ্বর। এ জগৎ অনুসন্ধান কর। পীড়ার সময় সাবিত্রীর ন্যায় তোমাব সেবা করিবে, বিপদের সময় নৃমুণ্ডমালিনীর ন্যায় তোমার পার্শ্বে অসিহস্তে দাঁড়াইবে, কুশলের সময় বিমল প্রণয়দানে তোমার হৃদয় তৃপ্ত করিবে, যুদ্ধের সময় যশোগীতে তোমার শরীর কণ্টকিত করিবে, এরূপ রমণী যদি পাও, তাহাকে গ্রহণ কর।

নরেন্দ্র। এরূপ নারী কি জগতে আছে?

শৈলেশ্বর। স্বয়ং দেখিতে পাইবে। নরেন্দ্র! আমার যোগবল মিথ্যা নহে, এরূপ নারী না থাকিলে আমি বৃথা তোমাকে এই গহ্বরে আহ্বান করি নাই। আর একটি কথা শুন। যে নারীর কথা আমি বলিতেছি, সে হেমলতা অপেক্ষা তোমাকে ভালবাসে, এ নারীকে তুমি পূর্বে দেখিয়াছ।

নরেন্দ্র। স্মরণ নাই।

শৈলেশ্বর। অদ্য স্বপ্নে দেখিবে। আমি চলিলাম, এই কলসে যে মদিরা আছে, পান করিয়া আজ এই গহ্বরে শয়ন কর। এই নির্বাণপ্রায় অগ্নির দিকে দেখ, যখন শেষ অগ্নিকণা সমস্ত ভস্ম হইয়া যাইবে, তখন সেই স্বপ্ন দেখিবে। যে নারীকে দেখিবে সেই এই জগতের মধ্যে তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী, তোমার ন্যায় অভিমানিনী। বীরপুরুষ! সেই তোমার উপযুক্ত বীরনারী।

নরেন্দ্র। মহাশয়, আপনার কথায় বিস্মিত হইলাম।

শৈলেশ্বর। আর একটি কথা আছে, এটি মন দিয়া শুন। এই স্বপ্ন দেখিয়া কাল প্রাতে তুমি এই গহ্বর হইতে বাহিরে যাইও। তিনদিন তোমাকে সময় দিলাম, স্বপ্নদৃষ্টা নারীকে বিবাহ করিবে কি না, তিনদিনের মধ্যে স্থির করিবে। যদি সম্মত হও, তবে তিনদিন পরে শ্বেতচন্দনরেখা ললাটে ধারণ করিয়া অমাবস্যার সায়ংকালে আমার সহিত এই গহ্বরে সাক্ষাৎ করিও, কিরূপে সে কন্যা পাইবে, তাহার উপায় বলিয়া দিব। যদি এ বিবাহে সম্মত না হও, তবে রক্তচন্দনের রেখা ললাটে ধারণ করিয়া ঐ অমাবস্যার সায়ংকালে এ স্থানে আমার সহিত সাক্ষাত করিও, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধান করিব। ইহাতে প্রতিশ্রুত হও, নচেৎ কালী তোমাকে স্বপ্ন দিবেন না।

নরেন্দ্র। প্রতিশ্রুত হইলাম, তিনদিন পর অমাবস্যার সন্ধ্যায় আপনার সহিত এই গহ্বরে সাক্ষাৎ করিব। ইহাতে যে প্রকার অঙ্গীকার করিতে বলেন, করিতে প্রস্তুত আছি।

শৈলেশ্বর। তুমি বীরপুরুষ, তোমার কথাই অঙ্গীকার। রজনী তিন-প্রহর হইয়াছে, আমি বিদায় হইলাম।

॥ চব্বিশ ॥

নরেন্দ্র অনেকক্ষণ সেই অন্ধকার গহ্বরে বিচরণ করিতে লাগিলেন, বাল্যকালের ভালবাসা, যৌবনের প্রেম সহসা উৎপাটিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। একাকী অনেকক্ষণ সেই গহ্বরে পদচারণ করিতে লাগিলেন। কি ভীষণ চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাহা আমরা অনুভব করিতে সাহস করি না।

অনেকক্ষণ পর অগ্নি নির্বাণপ্রায় দেখিয়া তিনি শৈবের আদেশ স্মরণ করিলেন, কলসে যে মদিরা ছিল, তাহা সমস্ত পান করিলেন। মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, অগ্নির একপার্শ্বে নরেন্দ্রনাথ শয়ন করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ অগ্নি দেখিতে লাগিলেন। এক একবার কাষ্ঠের এক অংশ প্রদীপ্ত হয়, আবার নির্বাপিত হয়, এক একটি স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়, আবার অঙ্গার হইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি প্রায় সমস্ত নির্বাপিত হইল, হীনতেজ আলোকে সেই শিলাগৃহের শিলাভিত্তি আরও অপরূপ দেখাইতে লাগিল। নরেন্দ্র সেই ভিত্তির উপর আলোক ও ছায়ার নৃত্যকে যেন অমানুষিক জীবের নৃত্য দেখিতে লাগিলেন, কালীর নয়নদ্বয়-যেন ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, কালী হস্তের খড়্গ যেন নরেন্দ্রের দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্র উঠিবার চেষ্টা করিলেন, উঠিবার শক্তি নাই। নরেন্দ্র জাগ্রত না সুপ্ত?

অচিরাৎ শেষ অগ্নিকণা নির্বাণ হইল। নরেন্দ্র তাহা দেখিতে-ছিলেন না, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। এতক্ষণ দূরস্থ জলের শব্দ যাহা শুনা যাইতেছিল, নরেন্দ্রের বোধ হইল, যেন তাহা সহসা পরিবর্তিত হইয়া স্বর্গীয় সঙ্গীতধ্বনি হইল। গভীর অন্ধকারে যেন ক্রমে আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হইতে লাগিল। যে স্থানে গহ্বরের ভিত্তি ছিল, তথায় যেন একটি প্রস্তর সহসা সরিয়া যাইল, তাহার ভিতর হইতে অপূর্ব সঙ্গীতধ্বনি অপূর্ব চন্দ্রালোকের ন্যায় আলোক বাহির হইতে লাগিল। ক্রমে যেন চন্দ্রের উপর হইতে মেঘ সরিয়া গেল, সে আলোকস্থান সম্পূর্ণ মুক্ত হইল। এ কি স্বপ্ন না যথার্থ? স্বর্গীয় রূপরাশি বিভূষিতা একটি ষোড়শী বীণাহস্তে উপবেশন করিয়া অপূর্ব বাদ্য করিতেছে। নরেন্দ্র বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া সেই অপূর্ব স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

কি অপূর্ব সৌন্দর্য, কি উজ্জ্বল নয়ন, কি কৃষ্ণ কেশপাশ, কি ক্ষীণ অঙ্গ! এ কি মানবী? নরেন্দ্রনাথ, ভাল করিয়া দেখ, এ বদনমণ্ডল, এ চারুনয়ন, এ ওষ্ঠ কি তুমি কখনও দেখ নাই? সুদূরশ্রুত সঙ্গীতের ন্যায় স্মৃতিশক্তি নরেন্দ্রের মনে ক্রমে ক্রমে জাগরিত হইতে লাগিল। কাশীর যুদ্ধ, দিল্লী, দিল্লীতে একজন মুসলমান নারী—উঃ! এ সেই জেলেখা!

নরেন্দ্রের চিন্তা করিবার অবসর ছিল না। সহসা সপ্তস্বরসমন্বিত অপ্সরাকণ্ঠনিঃসৃত অপূর্ব গীত সেই পর্বতকন্দর আমোদিত করিল; নরেন্দ্রের হৃদয় আলোড়িত করিল। জেলেখা সেই বীণার সঙ্গে সঙ্গে গান সংযোজনা করিয়াছে। আহা! কি মধুর, কি হৃদয়গ্রাহী, কি ভাবপরিপূর্ণ! নরেন্দ্র একদৃষ্টিতে জেলেখার দিকে চাহিয়া রহিলেন, গাইতে গাইতে জেলেখার কণ্ঠ একবার রুদ্ধ হইল, নয়ন দিয়া দুই এক বিন্দু জল গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতে লাগিল।

"নারীর ধর্ম কি? সতী কি সাধিতে পারে?

আজীবন প্রেমবারিদানে পতির প্রেমতৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে। সম্পদ্‌কালে প্রেমালোক জ্বালিয়া লক্ষ্মীরূপিণী পতির আনন্দবর্ধন করিতে পারে। রণের মাঝে বীর্যবতী প্রদীপ্ত আশারূপিণী হইয়া পতির হৃদয় বীররসে পরিপূর্ণ করিতে পারে। দুঃখ-অন্ধকারে জীবনের আশা-প্রদীপ একে একে নির্বাণ হইয়া গেল। সমদুঃখিনী হইয়া স্বামীর ক্লেশ বিমোচন করিতে পারে। জীব-আকাশ হইতে জীবতারা যখন খসিয়া যায়, পতিব্রতা নারী উল্লাসে প্রিয়ের পার্শ্বে সহমৃতা হইতে পারে।"

এই মর্মের সুন্দর গান সমাপ্ত হইল, কিন্তু নরেন্দ্রের কর্ণমূলে তখনও সে সঙ্গীত শেষ হইল না। একবার সুমধুর ধীরশব্দে, এক একবার বজ্রনাদে তাঁহার কর্ণে সে গান এখনও শব্দিত হইতে লাগিল। জেলেখা মানবী কি পরীকন্যা? যেই হউক, নরেন্দ্র তাহার মুখমণ্ডল বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন পূর্বে যে রূপ দেখিয়াছিলেন, এখন জেলেখা তাহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর সৌন্দর্য ধারণ করিয়াছে। তথাপি শোকের পাণ্ডুবর্ণ ললাট ন্যস্ত করিয়াছে, বাহু ও অঙ্গুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, নয়নদ্বয়ে যেন দুঃখ নিবাস করিতেছে। নরেন্দ্র আর দেখিবার সময় পাইলেন না, আবার অপূর্ব সঙ্গীতধ্বনি পর্বতকন্দর কাঁপাইতে লাগিল, আবার দুঃখের গানে নরেন্দ্রের হৃদয় আলোড়িত ও দ্রবীভূত হইল।

পতির নিকট পতিব্রতা নারী কি ভিক্ষা চাহে? প্রেম-ভিক্ষা ভিন্ন এ জগতে দাসীর আর কি ভিক্ষা আছে? প্রেম-লতিকার বেশে, তোমার পদযুগল ধরিয়াছে, স্নেহকণা দিয়া সজীব করিও যেন ধরণী না লুটায়। জাতি, বন্ধু, দেশ দূরে রাখিয়া তোমার নিকট আসিয়াছে. যেন তোমার সুখে সুখিনী হয়, তোমার দুঃখে দুঃখিনী হয়, তোমার পদছায়া যেন প্রায়। যতদিন প্রাণ থাকে, ইহা ভিন্ন অন্য ভিক্ষা নাই, আয়ু শেষ হইলে পতির চরণ ধরিয়া পতির মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, ইহা ভিন্ন সতীর আর কি ভিক্ষা আছে?

গান সমাপ্ত হইল। নয়নজলে সে পাণ্ডুর বদনখানি ও উরস্থল ধৌত হইয়া গেল। ধীরে ধীরে মেঘচ্ছায়ায় যেন সূর্যকান্তি আচ্ছন্ন হইল, আলোদ্বার ক্রমে রুদ্ধ হইল, সে স্বর্গীয় মূর্তি ঢাকিয়া গেল, গভীর অন্ধকারে বীণাধ্বনি থামিয়া গেল, পূশ্রুত দূরস্থ জলশব্দ ভিন্ন নরেন্দ্র আর কিছু শুনিতে পাইলেন না। নরেন্দ্র গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন, আর কি স্বপ্ন দেখিলেন. প্রাতে তাহার মত্ততা আর নাই, গহ্বর হইতে খড়্গ লইয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, নবজাত সূর্যরশ্মিতে বৃক্ষলতা ও দূর্বাদল ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, ডালে ডালে পক্ষিগণ গান করিতেছে, দূরে একলিঙ্গের প্রকাণ্ড শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিত মন্দির সূর্যকিরণে বড় শোভা পাইতেছে। মন্দির লোকসমাকীর্ণ আর চতুর্দিকে বহুদূরে পর্বতের উপর পর্বত সূর্যরশ্মিতে সুন্দর দেখা যাইতেছে।

॥ পঁচিশ ॥

সেই তিন দিন নরেন্দ্রনাথ কি চিন্তাজালে বেষ্টিত ও ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। শত চিন্তা নরেন্দ্রনাথকে শত বৃশ্চিক-দংশনাপেক্ষা অধিক ক্লেশ দিতে লাগিল।

সেই পর্বত-গহ্বরে শৈলেশ্বর যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা নরেন্দ্রের হৃদয় হইতে তিরোহিত হইল না। শ্রীশচন্দ্রের সহিত হেমলতার বিবাহ হইয়াছে, অনেকদিন হইল, নরেন্দ্র তাহা শুনিয়াছেন। হেমলতা পরের গৃহিণী, তাহার চিন্তা, তাহার প্রতি ভালবাসা কি উচিত কার্য? নরেন্দ্রনাথ, এই কি বীরের উপযুক্ত কার্য? শৈবের উন্নত আদেশ গ্রহণ কর, প্রেম-চিন্তা উৎপাটন কর, যশের পথ পরিষ্কার কর, দেশের গৌরবসাধন কর, ইহা অপেক্ষা বীরের উপযুক্ত কার্য আর কি আছে? নরেন্দ্র স্থির করিলেন, শৈবের আদেশ শিরোধার্য।

আবার সেই গঙ্গাতীরে বিদায়ের কালে নক্ষত্রের আলোক যে পাণ্ডুবর্ণ শুষ্ক মুখখানি দেখিয়াছিলেন ধীরে ধীরে সেই দুঃখিনী হেমলতার কথা মনে পড়িল, নরেন্দ্রের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সেই হেম বাল্যকালে নরেন্দ্রের সহিত খেলা করিয়াছে, যেদিন নরেন্দ্র গৃহত্যাগী হয়, সেদিন হেম যেন আপন জীবনকে বিদায় দিতেছিল, তাহা নরেন্দ্রের মনে পড়িল। বাল্যকালে হেম নরেন্দ্র ভিন্ন আর কাহাকেও জানিত না, যৌবনের প্রারম্ভে প্রাত সন্ধ্যা নরেন্দ্রের মুখ দেখিলে যেন হেম উদ্বেগশূন্য ও শান্ত হইত। বাল্যকালের সহস্র কথা অজস্র বারিতরঙ্গের ন্যায় নরেন্দ্রের হৃদয় ব্যথিত ও আলোড়িত করিতে লাগিল, নরেন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিল না, একাকী মন্দিরপার্শ্বে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

আবার চিন্তা আসিতে লাগিল। নরেন্দ্রের দেশ নাই, গৃহ নাই, বন্ধু নাই, পরিজন নাই, নরেন্দ্র একাকী দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কেবল হেমের চিন্তাস্বরূপ নক্ষত্রের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সংসারসমুদ্রে বিচরণ করিতেছেন। নিদারুণ শৈব! অভাগার একমাত্র সুচিন্তা, একমাত্র সুখস্বপ্ন দূর করিও না, এ নিদারুণ আদেশ করিও না। নরেন্দ্র অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছে, আরও যে ক্লেশ আদেশ কর, সহ্য করিতে প্রস্তুত আছে। নরেন্দ্র

যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিবে, বীরমর্যাদা ত্যাগ করিবে, অন্নকষ্ট ভোগ করিতে সম্মত আছে, জগতের নিন্দাভার বহন করিতে সম্মত আছে, অথবা সংসার পরিত্যাগ করিয়া সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তুর সহিত ঘোর অরণ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে সম্মত আছে। শৈলেশ্বর! আদেশ কর, ইহাতে যদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, নরেন্দ্র আজ্ঞা শিরোধার্য করিবে, ইহাতে যদি নরেন্দ্র মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কোচ করে, করালবদনার সম্মুখে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিও কিন্তু বাল্যকাল অবধি যে চিন্তা অবলম্বন করিয়া নরেন্দ্র জীবন-ধারণ করিতেছে, যে আলোকস্তম্ভরূপ চিন্তার জ্যোতিতে নরেন্দ্র দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছে, নিদারুণ শৈব! সে চিন্তা দূর করিতে বলিও না। এখন হেম পরের গৃহিণী, তথাপি নরেন্দ্রের ভালবাসা বিস্মৃত হয় নাই, নরেন্দ্র তাহার চিন্তা ত্যাগ করিবে? নরেন্দ্র মুসলমান হইয়া যবনীকে বিবাহ করিবে? হেম তাহা শুনিবে? সে ভাবনা অসহ্য! প্রবঞ্চক শৈব! হিন্দু পুরোহিত হইয়া তুমি যবনীর পাণিগ্রহণ করিতে উপদেশ দাও? বিধর্ম্মী! কপটাচারিন্! দূর হও।

আবার শৈলেশ্বরের গম্ভীর আদেশ মনে পড়িল, "হা নরেন্দ্রনাথ! আপনাকে ভুলাইও না, আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। যে ঘোর পাপে লিপ্ত হইয়াছ, তাহা বিশেষ করিয়া আলোচনা কর। শৈব মিথ্যাবাদী? পরনারী চিন্তা কি পাপ নহে? নরেন্দ্রনাথ, সাবধান! আপনি পাপে লিপ্ত হইতেছে, শৈব তোমার দোষ দেখাইয়া দিতেছেন, তাঁহার নিন্দা করিও না। নরেন্দ্রনাথ ভাবিয়া ভাবিয়া, সেদিন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

তিন দিন অতিবাহিত হইল, তৃতীয় দিবস রজনীতে নির্দিষ্ট সময়ের দুই দণ্ড পূর্বে নরেন্দ্রনাথ গহ্বরমুখে একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এক একবার এদিক ওদিক নিঃশব্দে পদসঞ্চারণ করিতেছেন, এক একবার অন্ধকার আকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টি

করিতেন, আবার গহ্বরমুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতেছেন। হস্তে নিষ্কাষিত অসি ; আকৃতি স্থির ও গম্ভীর।

ক্ষণেক পরে শৈলেশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও নরেন্দ্রকে আশীর্বাদ করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে প্রণাম করিতে বিস্মৃত হইলেন।

শৈলেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছ ?"

গম্ভীর ও ঈষৎ কর্কশস্বরে নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হইয়াছি।" উভয়ে গহ্বরে প্রবেশ করিলেন।

গহ্বরে পূর্বদিনের ন্যায় অতি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল, সেই আলোকচ্ছটায় শৈলেশ্বর যাহা দেখিলেন, তাহাতে চমকিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথের ললাট, গণ্ডস্থল, স্কন্ধ, বাহু ও বক্ষস্থল রক্তচন্দনে একেবারে প্লাবিত রহিয়াছে।

শৈলেশ্বর। পাপিষ্ঠ! পরস্ত্রী আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারিলে না ?

নরেন্দ্র। পরস্ত্রী-আকাঙ্ক্ষা রাখি না।

শৈলেশ্বর। হেমলতাকে এ জীবনে আর দেখিতে চাহ না ?

নরেন্দ্র। তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।

শৈলেশ্বর। তবে যবনীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত আছ ?

নরেন্দ্র। এ জীবনে নহে।

শৈলেশ্বর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন ; আবার বলিলেন, "তবে প্রতিজ্ঞাপালনে প্রস্তুত হও। খড়্গ ত্যাগ কর, কালীর সম্মুখে জীবনদানে প্রস্তুত হও।"

নরেন্দ্র। আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা পালন করিয়াছি। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়াছিলাম।

শৈলেশ্বর। মূঢ়! সিংহের গহ্বরে আসিয়াও জীবনের প্রত্যাশা কর ? এস্থলে কে তোমার সহায় হইবে ?

নরেন্দ্র। এই অসি আমার সহায়।

শৈলেশ্বর নিঃশব্দে গহ্বরের একস্থান হইতে আপন অসি

বাহির করিলেন। উদয়পুরে একবার যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, অদ্য আবার দুইজনে সেইরূপ অসি ও ঢাল লইয়া যুদ্ধ হইল। নরেন্দ্র সেদিন অপেক্ষা অধিক সাবধানে অধিক যত্নে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে যত্ন বৃথা। সিংহবীর্য শৈব অল্পক্ষণ মধ্যেই নরেন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার অসি কাড়িয়া লইলেন।

শৈলেশ্বর। কেবল পূজা ব্যবসায়ে এই কেশ শুক্ল হয় নাই। রাজস্থান-ভূমি বীরপ্রসবিনী, যুদ্ধকালে শৈব-গোস্বামিগণও বীর্যপ্রকাশে রাজস্থানে অগ্রগণ্য। বালক! তোমার সহিত যুদ্ধ করিলাম, এই আমার কলঙ্ক রহিল।

নরেন্দ্র। আমি তাহার জন্যও প্রস্তুত আছি, তোমার যাহা ইচ্ছা, যাহা সাধ্য কর।

শৈলেশ্বর একগাছি রজ্জু বাহির করিলেন, নরেন্দ্রের দুই হস্ত সেই রজ্জু দ্বারা সজোরে বন্ধন করিলেন। এরূপ জোরে বাঁধিলেন যে, হস্তের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল। নরেন্দ্র শব্দমাত্র উচ্চারণ করিলেন না। পরে পূর্বের ন্যায় কলস লইয়া নরেন্দ্রের মুখের নিকট ধরিয়া মদ্যপান করিতে বলিলেন, নরেন্দ্র তাহাই করিলেন। গোস্বামী গহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মত্ততাহেতু নরেন্দ্র অচিরাৎ ভূমিতে নিপতিত হইলেন, চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, গহ্বর-পার্শ্বে দুইজন যেন ধীরে ধীরে কথা কহিতেছে, এইরূপ তাঁহার বোধ হইতে লাগিল; শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্র মদিরাপ্রভাবে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন, পরে কি হইল, স্মরণ রহিল না।

কিন্তু সে নিদ্রা গভীর নহে। নরেন্দ্র সমস্ত রজনী স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, কখন স্বপ্ন দেখেন, কখন অর্ধেক জাগ্রত হইয়া থাকেন। কখন স্বপ্ন দেখেন, কখন জাগ্রত থাকেন, মত্ততাপ্রযুক্ত কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

অনেকক্ষণ পরে বোধ হইল, যেন পূর্বের একদিনের ন্যায় আবার অন্ধকার হইতে আলোকচ্ছটা প্রকাশ হইতে লাগিল,

আবার যেন প্রস্তরভিত্তি সরিয়া গেল, মেঘ সরিয়া গেলে যেন চন্দ্রালোক প্রকাশিত হইল। সেই আলোকে সেই উজ্জ্বলা রমণী? কিন্তু জেলেখা অদ্য গান গাহিতেছে না, অদ্য বীণাহস্তে আইসে নাই, অদ্য খড়্গাহস্তে!

কি ভয়ঙ্করী মূর্তি! নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে, সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ ওষ্ঠের উপর দন্ত চাপিয়া রহিয়াছে, সমস্ত বদনমণ্ডল ক্রোধপ্রোজ্জ্বলিত ও রক্তবর্ণ। বামার করে সেই শৈবের দীর্ঘখড়্গা, বামার বক্ষে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা। নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন, তাঁহার ললাট হইতে স্বেদ বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি উঠিবার উদ্যম করিলেন, কিন্তু স্বপ্নে বিপদাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় পলাইতে অক্ষম, উঠিতে অক্ষম।

বামা মৃণাল-করে খড়্গা ধারণ করিয়া গহ্বরে প্রবেশ করিল; একবার দণ্ডায়মান হইল, একবার নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল। হস্ত হইতে খড়্গা পড়িয়া গেল।

এবার সেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিল, এবার অকম্পিত-হস্তে সে ছুরিকা নরেন্দ্রের বক্ষস্থলের উপর ধরিল। আবার কি চিন্তা আসিল, ছুরিকা হস্তভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইল, বামা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

নরেন্দ্র চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিয়া বসিলেন, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, ঘর্মে তাঁহার সমস্ত শরীর আপ্লুত হইয়াছে, উন্মত্ততা গিয়াছে, গহ্বর অন্ধকার ও নিস্তব্ধ। ধীরে ধীরে তিনি গহ্বরের বাহিরে আসিলেন। রজনী অবসানপ্রায়, পূর্বদিকে রক্তিমচ্ছটায় আকাশ রঞ্জিত হইয়াছে। নির্বাণপ্রায় প্রদীপের ন্যায় দুই-একটি তারা এখনও দেখা যাইতেছে, প্রত্যূষের শীতল বায়ু সেই পর্বতশ্রেণী ও শিবমন্দিরের উপর বহিয়া যাইতেছে ও নবজাত পুষ্পপরিমল বহিয়া নিদ্রোত্থিত জগৎকে আমোদিত করিতেছে। দুই একটি নিকুঞ্জবন হইতে দুই-একটি পক্ষী সুন্দর গীত করিতেছে।

॥ ছাব্বিশ ॥

উপরি-উক্ত ঘটনার কিছু পর যোধপুরাধিপতি রাজা যশোবন্তসিংহ পুনরায় সৈন্য-সামন্ত লইয়া আওরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ-করনাভিলাষে আগ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নরেন্দ্রনাথও সেই সৈন্যের সহিত রাজস্থান ত্যাগ করিলেন। যে কয়েক মাস নরেন্দ্রনাথ উদয়পুরে ছিলেন, তাহার মধ্যে আগ্রায় একটি রাজবিপ্লব ঘটিয়াছিল। আগ্রায় এক্ষণে সে সম্রাট্ নাই, সে রাজত্ব নাই। সে বিপ্লবের কথা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক, ইতিহাসজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা করিলে এ পরিচ্ছেদ ছাড়িয়া যাইতে পারেন।

এই ভীষণ ভ্রাতৃযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া অবধি প্রথমে বারাণসীতে সুলতান সুজা ও তৎপরে উজ্জয়িনীতে যশোবন্তসিংহ পরাস্ত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। এই শেষ ঘটনার বিষয় শুনিয়া সম্রাট্ শাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া এক লক্ষের অধিক সেনা লইয়া স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন ও চম্বল নদীতীরে শিবির-স্থাপন করিয়া মোরাদ ও আওরংজীবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ তাঁহারা ঐ নদীর অপর পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোরাদ যেরূপ সাহসী, সেইরূপ যুদ্ধ-কৌশলেও বিজ্ঞ, তিনি নদী পার হইয়া সংগ্রাম করিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কৌশলপটু আওরংজীব তাহা না করিয়া দারাকে ভুলাইবার জন্য শিবির সেইস্থানে ত্যাগ করিয়া গোপনে সৈন্যসুদ্ধ নদীর অপর একস্থানে পার হইলেন ও আগ্রা হইতে ৭।৮ ক্রোশ দূরে যমুনাতীরে শ্যামনগর নামক গ্রামে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। শত্রু চম্বল পার হইয়াছে ও আগ্রার নিকট যমুনাতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছে শুনিয়া দারা একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন, তিনি তৎক্ষণাত আপন সৈন্য লইয়া সেই গ্রামের নিকট যমুনাতীরে আপন শিবির সন্নিবেশিত করিলেন।

শ্যামনগরের যুদ্ধের ফল ভারতবর্ষের সিংহাসন। উভয় পক্ষই এই যুদ্ধে লিপ্ত হইতে সঙ্কুচিত হইলেন, চারি দিবসকাল উভয় সৈন্য 'উভয়ের সম্মুখীন হইয়া রহিল, পঞ্চম দিবসে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে যুদ্ধের বর্ণনায় আমাদিগের আবশ্যক নাই। দারার বামপার্শ্বে রাজপুত-রাজ রাজা রামসিংহ ও চত্বরশাল বীরোচিত বিক্রম প্রকাশ করিয়া নিহত হইলেন, দারার দক্ষিণ দিকে কালীউল্লা নামক মুসলমান সেনাপতি বিদ্রোহী আওরংজীবের অর্থভুক, তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন না। অবশেষে আওরংজীবের জয় হইল।

যুদ্ধক্ষেত্রে কৌশলপটু আওরংজীব কালীউল্লার সম্মান করিলেন ও মোরাদকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টিসাধন করিলেন।

অচিরাৎ আওরংজীব ছলে-বলে-কৌশলে আগ্রা হস্তগত করিয়া পিতাকে বন্দী করিলেন। শাজাহানের দুই কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠ রৌশন-আরা সকল বিষয়ে আওরংজীবকে সমাচার প্রদান করিয়া তাঁহার অনেক সহায়তা করিতেন। আওরংজীবের জয় হওয়ায় রৌশন-আরার প্রভুত্ব ও ক্ষমতার ইয়ত্তা রহিল না। শাজাহানের জ্যেষ্ঠ কন্যা জেহান-আরা রূপে, গুণে, কৌশলে কনিষ্ঠা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠা,—সে লাবণ্যময়ী সম্রাট্‌পুত্রীকে পাঠক একদিন বেগম-মহলে দেখিয়াছেন। আওরংজীবের জয়ে জেহান-আরা হতমানা হইলেন, অতঃপর পিতার সেবায় জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

আগ্রা হস্তগত করিয়া আওরংজীব দিল্লীযাত্রা করিলেন, পথে মথুরাতে মোরাদকে নিমন্ত্রণ করিলেন, মোরাদ মদিরাপানে এবং সুন্দরী গায়িকা ও নর্তকীগণের সৌন্দর্যে মত্ত হইয়া পড়িলেন। মোরাদকে মধ্যে করিয়া সেই জনবিমোহিনীগণ চারিদিকে বেষ্টন করিয়া বসিল, মোরাদ একেবারে প্রমত্ত একজন সুন্দরীর আলিঙ্গনে অচেতন হইয়া পড়িলেন। আওরংজীবের তাহাই উদ্দেশ্য, মোরাদ সেই রজনীতেই কারারুদ্ধ হইলেন।

তাহার পর? তাহার পর আওরংজীব রাজচ্ছত্র আপন মস্তকের

উপর ধারণ করিলেন। দারা সিন্ধুনদের দিকে পলায়ন করিলেন। বঙ্গদেশ হইতে সুলতান সুজা পুনরায় সৈন্য লইয়া যুদ্ধবেশে বহির্গত হইলেন, রাজস্থানে যশোবন্তসিংহ পরাজয়ের অপমান এখনও বিস্মৃত হয়েন নাই, তিনিও সসৈন্যে বহির্গত হইলেন।

॥ সাতাশ ॥

কয়েক দিবস ভ্রমণান্তর যশোবন্তসিংহের সেনা আগ্রা নগরে উপনীত হইল। আওরংজীবের পরাক্রম অসীম, তাহার সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করা যশোবন্ত সিংহের সাধ্য নহে, তিনি সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আওরংজীবের মিত্রবেশে পরম শত্রু আগ্রা নগরে প্রবেশ করিল।

যমুনার অনন্ত সৌন্দর্য ও আগ্রানগরের অপূর্ব শোভা দেখিয়া কে না বিমোহিত হইয়াছে ? শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্মিত, অপূর্ব চারুশিল্পখচিত, জগতের অতুল্য তাজমহল সন্ধ্যার নীল-গগনে একটি প্রতিকৃতির ন্যায় বোধ হয়; তাহার চতুর্দিকে সুন্দর পথ, সুন্দর কুঞ্জবন, সুন্দর ফোয়ারা; পার্শ্বে শ্যামা যমুনা। আগ্রার প্রকাণ্ড দুর্গ; তন্মধ্যে মর্মর-প্রস্তর-বিনির্মিত সুন্দর মতি-মস্‌জিদ, দেওয়ান-খাস, দেওয়ান-আম, রংমহল, শীলমহল। আগ্রার সৌন্দর্য কত বর্ণনা করিব ? পাঠকগণ ! যদি এই অপূর্ব নগর না দেখিয়া থাকেন, অদ্যই যাইবার উদ্যোগ করুন। “তিনি” ব্যয়ের ওজর করিবেন, তাহা শুনিবেন না, আপনাদিগের অনুরোধ অলঙ্ঘনীয়, আপনাদিগের অশ্রুজলে সকল আপত্তি ভাসিয়া যাইবে।

প্রসিদ্ধ ময়ুর-সিংহাসনে অদ্য সম্রাট্ আওরংজীব উপবেশন করিয়াছেন। প্রাসাদেও শ্বেত-স্তম্ভরাশি বড় শোভা পাইতেছে। রক্তবর্ণ চন্দ্রতাপ হইতে পুষ্পমাল্যের সহিত মণি-মাণিক্য ঝুলিতেছে ও প্রাতঃকালের আলোকস্পর্শে অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। চারিদিকে মহারাজা, রাজা, ওমরাহ, মনসবদার প্রভৃতি ভারতের

অগ্রগণ্য বীর, ধনী ও মান্য লোকে অদ্য রাজপ্রাসাদকে ইন্দ্রপুরী করিয়াছে।

সেই প্রাসাদের সম্মুখে বিস্তৃত শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে, শিবিরের চতুর্দিকে রৌপ্য-বিনির্মিত স্তম্ভ ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। উপরের বস্ত্র উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, ভিতরে মুসলীপত্তনের ছিট, সেই ছিটে লতা-পুষ্প এরূপ সুন্দর বিচিত্র হইয়াছে যে, শিবিরের পার্শ্বে যথার্থ পুষ্প ফুটিয়াছে, দর্শকদিগের এরূপ ভ্রম হয়। ভূমিতে অপরূপ গালিচা, তাহাতেও পুষ্পগুলি এরূপ সুন্দরভাবে বুনা হইয়াছে যে, শিবিরস্থ ব্যক্তি পুষ্প দলিত হইবে ভয়ে সহসা পদক্ষেপ করিতে সঙ্কোচ করেন।

তাহার বাহিরে দুর্গের প্রাচীর পর্যন্ত জয়পতাকা ও পুষ্পপত্র দ্বারা দুর্গ সুশোভিত হইয়াছে। সেনাগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিজয়বাদ্যে সকলের মন উত্তেজিত করিতেছে, নবজাত সূর্যরশ্মিতে তাহাদের বন্দুক ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। দুর্গপ্রাচীরের ওপর ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ সৈনিকগণ ঘন ঘন কামান ছাড়িতেছে। তাহারা বহুদূর হইতে রত্নগর্ভ ভারতবর্ষে রত্ন কুড়াইবার জন্যে আসিয়াছে ও 'সম্রাটের বেতনভোগী' হইয়া অদ্য কামানের শব্দে সম্রাটের বিজয় প্রচার করিতেছে। দুর্গের বাহিরে নগরের পথে, ঘাটে, গৃহে, দ্বারে ও যমুনাতীরে রাশি-রাশি লোক নিজ-নিজ সুপরিচ্ছদে সজ্জিত ও দলবদ্ধ হইয়া প্রশস্ত আগ্রা নগর ও যমুনাতীর পরিপূর্ণ করিতেছে।

পুরাতন রীত্যানুসারে আওরংজীব সুবর্ণের সহিত ওজন হইলেন, তাহার পর প্রধান প্রধান ওমরাহগণ ঐরূপে ওজন হইলেন। প্রত্যেক ওমরাহ রাজা ও মন্‌সবদার সুবর্ণ, মুক্তা ও হীরক নজর দিয়া সম্রাটের মনস্তুষ্টি করিলেন।

তাহার পর জগদ্বিমোহিনী কঞ্চনীগণ প্রৌঢ়-যৌবনমদে উন্মত্ত হইয়া অপূর্ব সঙ্গীত ও নৃত্য দ্বারা সভাসদ্‌গণের হৃদয় বিমোহিত করিল। কঞ্চনীগণ নর্তকী, বড় বড় ওমরাহদিগের মধ্যে বিবাহাদি কার্য হইলে তাহারা সঙ্গীত ও নৃত্য করিতে যাইত। শাজাহান

তাহাদিগকে সর্বদাই নিকটে রাখিতে ভালবাসিতেন ও বেগমদিগের আলয়েও লইয়া যাইতেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখপরাঙ্মুখ আওরংজীব তাহাদিগকে প্রায় নিকটে আসিতে দিতেন না, তবে আজি আনন্দের দিনে কঞ্চনীগণ কেন না সমাদৃত হইবে ?

তাহার পর দুর্গের পূর্বদিকে অর্থাৎ যমুনাতীরে মল্লযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ প্রভৃতি নানারূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রাসাদের উপর হইতে বেগমগণ দেখিতে পাইবেন, এইজন্য এইস্থলে যুদ্ধ হইত। অবশেষে দুইটি মত্ত হস্তীর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মধ্যে আন্দাজ দুই হাত উচ্চ একটি মৃত্তিকার প্রাচীর, তাহার দুইদিক হইতে দুটি মত্ত হস্তী মাহুত দ্বারা পরিচালিত হইয়া রণে লিপ্ত হইল। অনেকক্ষণ যমুনার উভয় পার্শ্ব হইতে লোক সবিস্ময়ে এই ভীষণ যুদ্ধ দেখিতে লাগিল, শুণ্ডের চপেটাঘাতে ও দন্তজনিত আঘাতে হস্তীদ্বয়ের মস্তক ও শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইল। প্রত্যেক হস্তীর দুইজন করিয়া মাহুত ছিল; একটি হস্তীর একজন মাহুত পড়িয়া গেল, সহসা হস্তী দ্বারা পদদলিত হইয়া জীবন ত্যাগ করিল; অপর পক্ষের একজন মাহুতের ঐরূপে জন্মের মত হাত ভাঙিয়া গেল। এই হতভাগারা এই জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াই হস্তীদ্বয়কে যুদ্ধে প্রমত্ত করিয়াছিল, বহু অর্থ লোভে স্ত্রী-পুত্র-সকলের নিকট বিদায় পূর্বে লইয়া আসিয়াছিল। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর একটি হস্তী অন্যকে পরাস্ত করিয়া, মৃত্তিকা-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পশ্চাদ্ধাবমান হইল। তাহাদিগকে ছাড়াইবার জন্য অনেকে চরকি প্রভৃতি আগুনের বাজী ছুঁড়িল, কিন্তু সঞ্জাত-ক্রোধ হস্তী তাহাতে নিরস্ত না হইয়া অপর হস্তীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, অবশেষে পরাজিত হস্তী সন্তরণ করিয়া যমুনা পার হইয়া গেল, পথিমধ্যে দুই একজন লোক যাহারা সম্মুখে পড়িল তাহারাও নিহত হইল।

এ সমস্ত আমোদ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে যমুনা-পুলিনে যাইলেন ও হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া একটি সুন্দর বৃক্ষমূলে শয়ন করিলেন। যেস্থানে নরেন্দ্রনাথ শয়ন করিলেন সেটি অতি মনোহর

স্থল। বিশাল তমাল-বৃক্ষ সূর্যের কিরণ নিবারণ করিতেছে ও বৃক্ষের উপর হইতে দুই-একটি পক্ষী যেন দিনের তাপে ক্লিষ্ট হইয়া অতি মৃদুস্বরে ডাকিতেছে। নিকটে বৃক্ষের একপার্শ্বে একটি পুরাতন কবর আছে, প্রস্তর স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে ও অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষলতাদি সেই কবরের উপর জন্মিয়াছে। কবরের একপার্শ্বে পারস্য-ভাষায় একটি বায়েৎ লেখা আছে, তাহার অর্থ, "বন্ধু! আমার নাম জানিবার আবশ্যক কি? আমি জগতে অভাগা, অসুখী ছিলাম। তুমি যদি হতভাগা হও, আমার জন্য একবিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিও।" মন্দ মন্দ যমুনাবায়ু হইতে শীতল স্থানকে আরও সুশীতল করিতেছে, কল্লোলিনী যমুনা সুমধুর কল-কল শব্দে বহিয়া যাইতেছে। নরেন্দ্রনাথ অচিরাৎ নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

তিনি কতক্ষণ নিদ্রিত রহিলেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। নিদ্রায় একটি অপরূপ স্বপ্ন দেখিলেন। বোধ হইল, যেন অপূর্ব গোরস্থান হইতে মৃত মনুষ্য পুনর্জীবিত হইল, সে একটি মুসলমান স্ত্রীলোক। মৃত্যুর শ্বেতবর্ণ স্ত্রীলোকের মুখে এখন দেদীপ্যমান। স্ত্রীলোকের চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, শরীর ক্ষীণ, সমস্ত অবয়ব দুঃখব্যঞ্জক। গোরস্থানে যে বায়েৎটি লেখা ছিল, স্ত্রীলোক যেন সেই বায়েৎটি গান করিল, সে দুঃখব্যঞ্জক গীতধ্বনিতে নরেন্দ্রের মুদ্রিত নেত্র হইতে একবিন্দু জল ভূতলে পতিত হইল। মুসলমানী যেন সহসা আর একটি গীত আরম্ভ করিল। নরেন্দ্রের বোধ হইল, যেন সে স্বর তাঁহার অপরিচিত নহে; বোধ হইল, যেন সে স্বর সেই অভাগিনী জেলেখার কণ্ঠনিঃসৃত। নরেন্দ্র, ভাল করিয়া দেখ, স্বয়ং জেলেখা গোরের উপর বসিয়া এই দুঃখগান গাইতেছে।

নরেন্দ্রের স্বপ্নভঙ্গ হইল, চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই। সূর্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যার ললাটে একটি উজ্জ্বল তারা বড় শোভা পাইতেছে, সন্ধ্যায় বায়ু রহিয়া রহিয়া মৃদু গান করিতেছে, যমুনার জল অধিকতর নীলবর্ণ ধারণ করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

নরেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। এই জেলেখার গান তিনি নিদ্রাযোগে

ইতিপূর্বে তিন-চারবার শ্রবণ করিয়াছেন। জেলেখার প্রতি কি নরেন্দ্রের হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছে? নরেন্দ্র হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, হৃদয় হেমলতাময়! জেলেখা কি মানবী নহে, জেলেখা কি পরী? তবে মানবের প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী কেন? নরেন্দ্রনাথ ভাবিতে ভাবিতে সেই গোরস্থানের দিকে আসিলেন, সহসা গোরের পার্শ্ব হইতে স্বয়ং জেলেখা দণ্ডায়মান হইল। তাহার ক্ষীণ শরীর ও পাণ্ডুবর্ণ বদনমণ্ডল দেখিলে বোধ হয় যেন, যথার্থই কবর-গহ্বরস্থ মৃতদেহ পুনর্জীবিত হইল। বদন পাণ্ডুবর্ণ বটে, কিন্তু নয়ন হইতে পূর্ববৎ তীব্র জ্যোতি বাহির হইতেছে। তীব্র জ্যোতির্ময়ী বামা সরোষে অধর দংশন করিয়া নরেন্দ্রের দিকে কটাক্ষপাত করিতেছে, বক্ষস্থলে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকার অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে। এই নারী কি দুঃখগান গাইতেছিল? বোধ হয়, না।

জেলেখা নরেন্দ্রকে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া আপনি অগ্রে চলিল, অনেক দূর যাইয়া দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া রাজপ্রাসাদের একটি অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্র এতক্ষণ ইতি-কর্ত্তব্যতবিমূঢ় হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, এক্ষণে গৃহের ভিতর অন্ধকারে রমণীর সহিত যাইতে সঙ্কোচ করিয়া বলিলেন, "তুমি কে জানি না' আমি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাই নাই।"

জেলেখা। প্রাসাদে যাইবার আমার অধিকার না থাকিলে তোমাকে আসিতে বলিতাম না।

নরেন্দ্র। তথাপি তুমি কে জানি না, অজ্ঞাত স্থানে যাইব না।

জেলেখা কর্কশস্বরে বলিল, "মৃত্যুভয় করিতেছ? তোমাকে হনন করিবার ইচ্ছা থাকিলে, আমি তাতারদেশীয়া, আমি এই ছুরিকা এতক্ষণ ব্যবহার করিতে পারিতাম না? কিন্তু এই লও, ছুরিকা ত্যাগ করিলাম, রিক্তহস্ত স্ত্রীলোকের সহিত যাইতে বোধ হয় বীরপুরুষের কোন আপত্তি নাই।"

জেলেখার বিকট হাস্যধ্বনিতে নরেন্দ্রের মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল। তিনি নিঃশব্দে জেলেখার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।

ক্ষণেক যাইলে পর জেলেখা একস্থানে কতকগুলি বস্ত্র দেখাইয়া নরেন্দ্রকে তাহা পরিধান করিতে কহিল। নরেন্দ্র তুলিয়া দেখিলেন, তাহা তাতারদেশীয় রমণীর পরিচ্ছদ। বিস্মিত হইয়া আবার জেলেখার দিকে চাহিলেন। জেলেখা এবার গম্ভীরস্বরে বলিল, "বিলম্ব করিও না, আমরা যে দ্বার দিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে সে দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, চারিদিকে খোজাগণ নিষ্কাষিত অসিহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এ বেগমদিগের প্রাসাদ, তুমি পুরুষ জানিলে এইক্ষণেই তোমার প্রাণ-বিনাশ করিবে।"

নরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিলেন, জেলেখার কথা সত্য। অগত্যা নরেন্দ্র কাঁচলি ও ঘাগরা পরিলেন, জেলেখা হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে পরচুলা পরাইয়া দিয়া মস্তকের উপর খোঁপা করিয়া দিল। নরেন্দ্র এই অদ্ভুত বেশে জেলেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদের অন্তঃপুরে চলিলেন।

নরেন্দ্র জেলেখার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন; কত গৃহ ও পথ অতিবাহিত করিলেন তাহা গণনা করা যায় না। দ্বারে দ্বারে অসিহস্তে খোজাগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও শত-শত পরিচারিকা এদিক-ওদিক পরিভ্রমণ করিতেছে। জেলেখাকে দেখিয়া সকলেই দ্বার ছাড়িয়া দিল।

নরেন্দ্রনাথ বেগমদিগের মহলের অভ্যন্তরে যত যাইতে লাগিলেন, ততই বিস্মিত হইলেন—ঐশ্বর্য, শিল্পকার্য ও বিলাসপ্রিয়তার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। শ্বেতমর্মরপ্রস্তর বিনির্মিত কত ঘর, কত প্রাঙ্গন, কত সুন্দর স্তম্ভসারি, কত উন্নত ছাদ, তাহা গণনা করা যায় না। সেই প্রস্তরে কী অপূর্ব শিল্পকার্য! দেওয়ালে স্তম্ভে প্রকোষ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের প্রস্তর শ্বেতপ্রস্তরে সন্নিবেশিত হইয়া লতা, পত্র, বৃক্ষ, পুষ্পের রূপ ধারণ করিয়াছে, যেন সুন্দর শ্বেত দেওয়ালের পার্শ্বে যথার্থই পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। ছাদ হইতে যেন সেইরূপ পুষ্প লম্বিত রহিয়াছে। অথবা উজ্জ্বল সুবর্ণমণ্ডিত ও চিত্রিত হইয়া অধিকতর শোভা ধারণ করিতেছে। শ্বেতপ্রস্তর-

বিনির্মিত সুন্দর গবাক্ষ, সুন্দর ফোয়ারা, সুন্দর পুষ্পাধার তাহার উপর মনোহর সুগন্ধ পুষ্প ফুটিয়া প্রাসাদকে আমোদিত করিতেছে। শ্বেত, পীত, বর্ণের আলোকে সেই রঞ্জিত ঘরের ভিতর ও বাহির দেখা যাইতেছে। জগতে অতুল্য রূপবতী বেগমগণ কেহ বা সেই ঘরে বা প্রকোষ্ঠে ভ্রমণ করিতেছেন, কেহ বা পুষ্পচয়ন করিয়া কেশে ধারণ করিতেছেন, কেহ বা আনন্দে গান করিতেছেন। আজ আনন্দের দিন, রাজপ্রাসাদ আনন্দ ও নৃত্যগীতে পরিপূর্ণ।

এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্র যেস্থানে স্বয়ং আওরংজীব ছিলেন, তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সম্রাট আওরংজীব বেগমদিগের সহিত পঁচিশী খেলিতেছেন। পঁচিশী ঘর শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্মিত ও প্রকাণ্ড; এক একটি রূপবতী কামিনী এক একটি ঘুঁটি। ঘুঁটি ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণেব হওয়া আবশ্যক, এইজন্যই কামিনীগণ ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন।

তথা হইতে নরেন্দ্র জেলেখার সঙ্গে একটি মর্মরপ্রস্তর-বিনির্মিত ঘরে প্রবেশ করিলেন। মর্মরপ্রস্তব-বিনির্মিত স্তম্ভসারি সাটিন ও মখমলে বিজড়িত নানাবর্ণের গন্ধদীপ আলোক ও সৎগন্ধদানে ঘর আমোদিত করিতেছে। ভিতরে তিন চারিজন বেগম বাদ্য ও গীত করিতেছেন, সপ্তস্বর-মিলিত সেই গীতধ্বনি উন্নত ছাদ উল্লঙ্ঘন কবিয়া যমুনাতীরে ও নৈশ গগনে প্রধাবিত হইতেছে।

সে গৃহ হইতে কিছু দূরে যমুনা নদীব দিকে একটি শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিত বারান্দায় সুন্দর চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে। এ স্থানটি নিস্তব্ধ ও রমণীয়। উপরে আকাশে নীলবর্ণ, দুই-একটি তারা দেখা যাইতেছে। শারদীয় চন্দ্র সুধাবর্ষণ করিয়া গগনকে শোভিত ও জগৎকে তৃপ্ত করিতেছে। নীচে নীলবর্ণ যমুনা নদী কল-কল শব্দে প্রধাবিত হইতেছে, তাহার চন্দ্রকরোজ্জ্বল বক্ষের উপর দুইখানি ক্ষুদ্র পোত ভাসমান রহিয়াছে। দক্ষিণে সুন্দর তাজমহল চন্দ্রকরে অধিকতর সুন্দর দেখা যাইতেছে। বারান্দা জনশূন্য, কেবল একজন রাজদাসী বীণাহস্তে গান করিতেছিল, এক্ষণে পরিশ্রান্ত হইয়া

বারান্দায় শ্বেতপ্রস্তরে মস্তক রাখিয়া বোধ হয় সুখের বা দুঃখের স্বপ্ন দেখিতেছে। যমুনার বায়ু রমণীর চন্দ্রকরোজ্জ্বল কেশপাশ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে অথবা সে বীণার উপর কখন কখন সুখের গান করিতেছে। বারান্দায় দণ্ডায়মান হইয়া ও যমুনার সুন্দর গান ও শীতল বায়ু ভোগ করিয়া নরেন্দ্রের হৃদয়ে নব-নব ভাব উদিত হইতে লাগিল। এইরূপ নিস্তব্ধ রজনীতে এইরূপ নদীতীরে নরেন্দ্র দূর-বঙ্গদেশে হেমকে শেষবার দেখিয়াছিলেন। আহা! সে সুন্দর মুখখানি চন্দ্র হইতেও সুধাপূর্ণ ও জ্যোতির্ময়। মুহূর্তের জন্য নরেন্দ্রের হৃদয় হেমলতা পূর্ণ হইল, নরেন্দ্র আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অন্যদিকে যাইলেন।

যেদিকে যাইবেন, সেদিক হইতে লোকের কলরব শুনিতে পাইলেন। প্রাসাদের মধ্যে এই কলরব শুনিয়া নরেন্দ্র কিছু বিস্মিত হইলেন এবং ঔৎসুক্যের সহিত সেইদিকে গমন করিতে লাগিলেন। যত নিকটে আসিলেন, ততই নারীকণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর কথা ও হাস্যধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; তিনি আরও বিস্মিত হইয়া সেইদিকে যাইয়া অবশেষে একটি জনাকীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সম্মুখে একটি অতি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন; প্রাঙ্গনে কত সুন্দর পুষ্পচারা পুষ্পলতিকা তাহা বর্ণনা করা যায় না। চতুষ্পার্শ্বস্থ হর্ম্যশ্রেণী হইতে পুষ্পমালা দুলিতেছে বৃক্ষলতায় পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে, স্থানে স্থানে স্তূপাকার পুষ্প রহিয়াছে, চারিদিকে সুগন্ধ পুষ্প বিকীর্ণ রহিয়াছে। সুদর্শন ফোয়ারা যেন দ্রব রৌপ্যস্তম্ভ নৈশ আকাশে উত্তোলন করিয়া আবার মুক্তারূপে চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছে। ঝোপে, বৃক্ষের অন্তরালে, সম্মুখে, পার্শ্বে, উচ্চে, নানাবর্ণের সুগন্ধ দীপাবলী জ্বলিতেছে, যেন আজ ইন্দ্রের অমরাপুরী লজ্জিত করিয়া এই বেগমমহল অপূর্ব রূপ ধারণ করিয়াছে। সেই প্রাঙ্গনে একটি বাজার বসিয়াছে, ক্রেতা-বিক্রেতা দলে দলে বিচরণ করিতেছে। অন্যান্য বাজার হইতে এই ভেদ যে, সকলেই রমণী। বিক্রেতা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজা, মহারাজা ওমরাহগণের মহিলাগণ,—ক্রেতা সম্রাটের বেগমগণ।

যে সমস্ত অসূর্যম্পশ্যা কোমলাঙ্গী লাবণ্যময়ী যুবতীগণ ক্রয়-বিক্রয় করিতেছেন, তাঁহাদিগের হাবভাব, রসিকতা ও বাক্-প্রগলভতায় নরেন্দ্র চমকিত হইলেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে বৎসর-বৎসর নওরোজার দিন দিল্লীর সম্রাটগণ বেগমমহলে এইরূপ একটা করিয়া বাজার বসাইতেন, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান মহিলাগণ এই বাজারে দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসিতেন। ওমরাহ ও রাজাগণ পরিবারস্থ রমণীদিগকে বেগমদিগের সহিত পরিচিত করিবার জন্য এই বাজারে পাঠাইতেন। পুরুষের মধ্যে কেবল স্বয়ং সম্রাট আসিতেন; পূর্ব প্রথামতে এই আনন্দের দিনে আওরংজীব সেইরূপ বাজার বসাইয়াছেন ও স্বয়ং দুই একজন বেগমের সহিত এক দোকান হইতে অন্য দোকানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। ভ্রাতৃযুদ্ধে আওরংজীবের ভগিনী রোশন-আরা আওরংজীবের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন, সে বাজারের মধ্যে রোশন-আরার ন্যায় কাহার গৌরব, কাহার প্রভুত্ব! অন্য ভগিনী জেহান-আরা দারার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, অদ্য এ মহোৎসবের মধ্যে জেহান-আরা নাই।

বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে নরেন্দ্রনাথ এই মহোৎসব দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সম্রাট একজন রূপবতী মোগলকন্যার নিকটে কতকগুলি অলঙ্কার ও সাটিন ও সুবর্ণখচিত বস্ত্রের দর করিতে আরম্ভ করিতেছেন। দর করিতে উভয়পক্ষই সমান পটু, কখন কখন এক পয়সার বিভিন্নতার জন্য মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইতেছে। আওরংজীব বলিলেন—"তোমার জিনিস মেকি, তুমি এখানে ঠকাইতে আসিয়াছ।" চতুরা মোগলকন্যা বলিলেন,—"তুমি কিরূপ খরিদ্দার। এরূপ কখনও দেখ নাই, ইহার দর তুমি কি জানিবে? তুমি ইহার উপযুক্ত নও, অন্যস্থানে যাও—তোমার যোগ্য দ্রব্য পাইবে।" এইরূপ বহু বাগ্‌বিতণ্ডার পর মূল্য অবধারিত হইল। ক্রেতা তখন যেন ভ্রমক্রমে দুই-চারিটি রৌপ্যমুদ্রার স্থানে বিক্রেতাকে সুবর্ণমুদ্রা দিয়া চলিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ এইরূপ বাজার দেখিয়া নরেন্দ্র জেলেখার আদেশানুসারে "শীশমহলে" প্রবেশ করিলেন, তথায় আবার অন্যরূপ অপরূপ দৃশ্য দেখিলেন। সম্রাট ও বেগমদিগের স্নানার্থ এই মহল নির্মিত হইয়াছে। শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্মিত শানের উপর দিয়া নির্মল জল প্রবাহিত হইতেছে, শানে অঙ্কিত প্রতিকৃতি দেখিয়া বোধ হয়, যেন জলের নীচের অসংখ্য মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে। চতুর্দিক হইতে ফোয়ারার নির্মল জল বেগে উঠিতেছে, আবার মুক্তারাশির ন্যায় প্রস্তরের উপর পতিত হইতেছে। ছাদ হইতে অসংখ্য দীপাবলী লম্বিত রহিয়াছে ও সেই সমস্ত দীপের বিবিধ বর্ণের আলোক ফোয়ারার জলের উপর বড় সুন্দরভাবে প্রতিহত হইতেছে। চতুর্দিক হইতে অসংখ্য দর্পণ রত্নরাজিখচিত হইয়া দেওয়ালে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কেন না স্না'কারিণী চতুর্দিকেই আপনার সুন্দর অনাবৃত অবয়ব দেখিতে পাইবেন। বিলাসপটু সম্রাটগণ বেগমদিগকে লইয়া এই গৃহে স্নান ও জলকেলি করিতে পারিবেন, এইজন্য কত দেশ হইতে অর্থ আনিত হইয়া এই অপূর্ব বিলাসগৃহ বিনির্মিত ও সুশোভিত হইয়াছে।

নানা দেশ হইতে অনেক মুসলমান ও হিন্দুরমণী অদ্য প্রাসাদে সমবেত হইয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকেই শীশমহলের অপূর্ব শোভা দেখিতেছিলেন। জেলেখা তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া, নরেন্দ্রকে হাত ধরিয়া একপাশে লইয়া গিয়া একটি দর্পণের নিকট আনিল এবং সেই দর্পণের ভিতর একটি ছায়া দেখাইল। চকিত ও নিস্পন্দ হইয়া নরেন্দ্র সেই দর্পণের ভিতর সেই ছায়া দেখিতে লাগিলেন, তথা হইতে আর নয়ন ফিরাইতে পারিলেন না। আলোকে আকৃষ্ট পতঙ্গবৎ নরেন্দ্র সেই ছায়ার দিকে চাহিয়া রহিলেন, অনিমেষলোচনে সেই দর্পণস্থ প্রতিমূর্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন, নরেন্দ্রনাথ কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? কি উন্মত্ত হইয়াছেন? নরেন্দ্রের শরীর কাঁপিতেছে, তাঁহার হৃদয় সজোরে আঘাত করিতেছে, তাঁহার নয়ন স্পন্দহীন। ক্রমে সে প্রতিমূর্তি দর্পণ হইতে সরিয়া গেল, সে রমণী অবগুণ্ঠন

টানিয়া শীশমহল হইতে বাহির হইলেন, উন্মত্ত নরেন্দ্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

রমণী রাজপুত বেশধারিণী। নরেন্দ্র ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিবার জন্য ক্রমে নিকটে আসিলেন, তথাপি রমণীর অনাবৃত বাহু ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না, মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া দেখা যায় না।

নরেন্দ্রেরও নারীবেশ, একবার ইচ্ছা হইল, রমণীর নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু নরেন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইল। একবার ইচ্ছা হইল, রমণীর হস্তে আপন হস্ত স্থাপন করেন, কিন্তু তাঁহার হস্ত উঠিল না, হৃদয় সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। অচিরাৎ সেই রমণী ও তাঁহার রাজপুত-সাঙ্গিনীগণ বাজার পরিত্যাগ করিলেন, নরেন্দ্রও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অনেক ঘর অনেক দ্বার, অনেক পুষ্পোদ্যান ও প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া বাহিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেক শিবিকা ছিল, রাজপুত কামিনীগণ নিজ নিজ শিবিকায় আরোহণ করিলেন। যে রমণীর দিকে নরেন্দ্র দেখিতেছিলেন তিনিও শিবিকায় আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেন। বোধ হইল, যেন তিনি যমুনা নদী ও আগ্রার রাজপ্রাসাদ পূর্বে দেখেন নাই, কেন না, শিবিকায় আরোহণ করিবার পূর্বে একবার প্রাসাদ ও নদীর দিকে স্থির দৃষ্টি করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যমুনার বায়ুতে তাঁহার অবগুণ্ঠন নড়িতে লাগিল, নরেন্দ্র তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইতে লাগিল। কিন্তু সে অবগুণ্ঠন উড়িয়া গেল না, নরেন্দ্র মুখ দেখিতে পাইলেন না। অচিরাৎ শিবিকাযোগে সে রাজপুতবেশ-ধারিণী চলিয়া গেলেন।

এ কি হেমলতা?—সেই গঠন, চলন, সেই বাহু। দর্পণে সেই মধুমাখা মুখখানি প্রতিফলিত হইয়াছিল। কিন্তু হেমলতা আগ্রার বেগমমহলে কেন? রাজপুত কি জন্য? নরেন্দ্রনাথ! প্রেমান্ধ হইয়া কাহাকে হেমলতা মনে করিতেছ? নরেন্দ্রনাথ! কেন দেশে দেশে সেই ছায়ার অনুধাবন করিতেছ?

॥ আঠাশ ॥

বীরনগরের জমিদারের প্রকাণ্ড অট্টালিকার পার্শ্বে সুন্দর ও প্রশস্ত উপবন ছিল, উপবন দিয়া নদীতীরে আসা যাইত। সেই উপবনে বাল্যকালে নরেন্দ্রনাথ ও হেমলতা দৌড়াদৌড়ি করিত, সেই নদীতীরে বালক-বালিকার সঙ্গে খেলা করিত, হাসিত, কাঁদিত আবার উচ্চ-হাস্যে উপবন আমোদিত করিত। আজি সেদিন পরিবর্তিত হইয়াছে, নরেন্দ্রনাথ শান্তিশূন্য-হৃদয়ে দেশে দেশে বেড়াইতেছেন, শ্রীশচন্দ্র শ্বশুরের সম্প্রতি মৃত্যু হওয়ায় জমিদার হইয়াছেন, হেমলতা আজি বালিকা নহেন, নব জমিদারের গৃহিণী।

সায়ংকালে সেই উপবন দিয়া দুইটি রমণী ঘাটে যাইতেছিলেন। একজন হেমলতা, অপরজন শ্রীশচন্দ্রের বিধবা ভগিনী।

হেমলতার বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চদশ বর্ষ হইবে, অবয়ব ক্ষীণ, কোমল ও উজ্জ্বল রূপরাশিতে পরিপূর্ণ নয়ন দুইটি জ্যোতির্ময়, ভ্রূযুগল সুচিক্কণ, ওষ্ঠ সূক্ষ্ম, গণ্ডস্থল রক্তিমচ্ছটায় আরক্ত, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও লাবণ্যময়। তথাপি যৌবনপ্রারম্ভে প্রফুল্লতা সে অবয়বে লক্ষিত হয় না, যৌবনের উন্মত্ততা সে মুখমণ্ডলে দৃষ্ট হয় না। বোধ হয়, যেন সেই সুন্দর ললাটে সেই স্থির চক্ষুদ্বয়ে, সে সুচিক্কণ ওষ্ঠে অল্পকালেই চিন্তার অঙ্ক অঙ্কিত হইয়াছে। নয়নের উজ্জ্বল জ্যোতি ঈষৎ স্তিমিত হইয়াছে, মুখমণ্ডলের প্রফুল্ল আলোকের উপর জীবনের সন্ধ্যার ছায়া বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যৌবনের সৌন্দর্য ও লাবণ্য দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু যৌবনের প্রফুল্লতা কৈ? প্রফুল্লতা থাকিলে কি হেম এরূপ নম্রভাবে ধীরে ধীরে যাইত? ঐ ক্ষুদ্র নতশির পুষ্পটিকে তুলিয়া কি উহার দিকে ঐরূপ স্থিরভাবে চাহিত? যে কৃষ্ণবর্ণ সুচিক্কণ কেশপাশে তাঁহার বদনমণ্ডল ও নয়নদ্বয় ঈষৎ আবৃত হইয়াছে, ধীরে ধীরে সযত্নে সরাইয়া দেখ, নয়নদ্বয়ে জল নাই তথাপি নয়নদ্বয় স্থির, শান্ত, যৌবনচিত চপলতাশূন্য। নিকটে যাইয়া

দেখ হেমলতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে না, তথাপি যেন ভারাক্রান্ত হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে নিশ্বাস বহির্গত হইতেছে। অর্ধ-প্রস্ফুটিত কোরকে দুঃখকীট প্রবেশ করে নাই, তথাপি কোরক জীবনাভাবে যেন ঈষৎ শুষ্ক ও নতশির। জীবনের অরুণোদয় যেন মেঘচ্ছায়ায় বিমিশ্রিত।

শৈবলিনীর বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশবর্ষ হইবে। শৈবলিনীর বিধবা অবয়বে যৌবনের রূপ নাই, অনির্বচনীয় পবিত্র গৌরব আছে। মস্তক হইতে নিবিড় কৃষ্ণ কেশপাশ পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে, ললাট সুন্দর, চক্ষু বিশাল ও শান্তপ্রভ, মুখমণ্ডল গম্ভীর অথচ কোমল, অবয়ব উন্নত ও বিধবার শুভ্রবসনে আবৃত। শৈবলিনী হেমলতাকে কনিষ্ঠার ন্যায় ভালবাসিত, সস্নেহ-বচনে তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে ঘাটে যাইতেছিল। শৈবলিনীর জীবন যেন মেঘশূন্য, বায়ুশূন্য সায়ংকাল, গভার, নিস্তব্ধ, শান্ত।

বাল্যকালে হেমলতা নরেন্দ্রনাথের মুখ দেখিলে ভাল থাকিত, যৌবনপ্রারম্ভে নরেন্দ্রনাথ হেমলতার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল, হেমলতা বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার হৃদয় নরেন্দ্রনাথপূর্ণ হইয়াছিল। যখন সেই নরেন্দ্রের সহিত চিরবিচ্ছেদ হইল, যখন হেম আর একজনের সহধর্মিণী হইয়া নরেন্দ্রের প্রতিমাকে হৃদয় হইতে বিসর্জন দিতে বাধ্য হইল, তখন প্রেম কি পদার্থ, হেম বুঝিতে পারিল, তখন মর্মভেদী দুঃখ আসিয়া হেমের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বালিকা সরলা নবোঢ়া বধূ, সে কথা কাহার কাছে বলিবে? সে দুঃখ কাহার কাছে জানাইবে?

শৈবলিনী পঞ্চবর্ষের সময়েই বিধবা হইয়াছিল, শ্বশুরালয়েই থাকিত, কখন কখন ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। শৈবলিনী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতি, দুই-তিনবার বীরগ্রামে আসিয়াই হেমলতার অন্তরের ভাব কিছু কিছু বুঝিতে পারিল, মনে মনে সঙ্কল্প করিল, "যদি বালিকাকে আমি যত্ন না করি, বোধ হয়, ভ্রাতার সংসার ছারখার হইয়া যাইবে।" শৈবলিনী সেই অবধি বীরগ্রামে রহিল।

শৈবলিনীর সস্নেহ ব্যবহারে ও প্রবোধবাক্যে হেমলতার দুঃখভার কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইল। শৈবলিনী মানবচরিত্র বিশেষরূপে বুঝিত, একবারও হেমকে তিরস্কার করিত না, কনিষ্ঠা ভগিনীকে যেন প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা করিত। তাহার সারগর্ভ স্নেহপরিপূর্ণ কথায় কোন্ দুঃখীর দুঃখ না বিদূরিত হয়? শৈবলিনী গল্প করিতে অতিশয় পটু, সর্বদাই হেমলতাকে পুরাণের গল্প বলিত। সে পবিত্র মুখে পবিত্র গল্প শুনিতে শুনিতে হেমলতা রজনীতে নিদ্রা বিস্মরণ হইত। গভীর রজনী গভীর বন, চারিদিকে বৃক্ষের অন্ধকার দেখা যাইতেছে, বায়ুর শব্দ ও হিংস্র জন্তুর নাদ শুনা যাইতেছে। রাজকন্যা দময়ন্তী অদ্য স্বামীর প্রেমকে একমাত্র অবলম্বন করিয়া, ধন মান রাজ্য তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, ভিখারিণীরবেশে বিচরণ করিতেছে। স্বামী তৃষ্ণার্ত হইলে গণ্ডুষ করিয়া জল দিতেছে, স্বামী বস্ত্রহীন হইলে আপন বস্ত্র দিতেছে, স্বামী পরিশ্রান্ত হইলে আপন অঙ্কে তাঁহার মস্তক স্থাপন করিয়া স্বয়ং অনিদ্রা হইয়া উপবেশন করিয়া আছে। সেই স্বামী যখন মায়া বিচ্ছিন্ন করিয়া অভাগিনীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইল তখনও অভাগিনীর স্বামী-চিন্তা ভিন্ন এ জগতে আর চিন্তা নাই, স্বামীর পুনর্মিলন ভিন্ন এ জগতে আর আশা নাই।

অথবা সেই মহর্ষি বাল্মীকির কুটীরে চিরদুঃখিনী বৈদেহী হস্তে গণ্ডস্থাপন করিয়া এখনও হৃদয়েশ্বরকে চিন্তা করিতেছে। সম্মুখে পুত্র দুইটি খেলা করিতেছে, তাহাদিগের মুখ অবলোকন করিতেছে, আবার শ্রীরামের চিন্তা করিতেছে। যিনি নিরাশ্রয়া, নিষ্কলঙ্কা, অন্তঃস্বত্ত্বা রাজকন্যা, রাজরাণী চিরনির্বাসিত করিয়াছেন, সেই নিষ্ঠুর পতিকেও অদ্যাবধি হৃদয়ে স্থান দিয়া অভাগিনী চিন্তা করিতেছে সেই পতিই সীতার জীবনের জীবন, হৃদয়ের সর্বস্ব ধন। পতিব্রতার কি মাহাত্ম্য?

রজনী তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত হেমলতা তাহার ধর্মপরায়ণা ননদিনীর নিকট এই সকল পুণ্যকথা শুনিত। দুঃখকথা শুনিয়া

হেমলতার হৃদয় আলোড়িত হইত, ননদিনীর হৃদয়ে বদন ঢাকিয়া দরবিগলিত ধারায় রোদন করিত; আবার মুখ তুলিয়া সেই পবিত্র কথা শুনিত, আবার শোকাকুলা হইয়া অবারিত অশ্রুজল ত্যাগ করিত। হেমলতা ভাবিত, সংসারে সকলেই দুঃখিনী, পুণ্যাত্মা সীতা দুঃখিনী, ধর্মপরায়ণা সাবিত্রী দুঃখিনী, আমি কি অভাগিনী যে নিজ দুঃখবিহ্বলা হইয়া রহিয়াছি? তাঁহারা সাধ্বী ছিলেন, পতিব্রতা ছিলেন, অভাগিনী হেমলতা আজও নরেন্দ্রের চিন্তা করে, দেবতুল্য স্বামীকে বিস্মৃত হইয়াছে। আমি অবলা, আমার বল নাই। ভগবান সহায় হও, পাপচিন্তা হৃদয় হইতে উৎপাটিত কর, অবলার যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিবে।

শৈবলিনীর অপরূপ স্নেহ ও প্রবোধবাক্যে হেমলতা ক্রমশ শান্তিলাভ করিল, হৃদয়ের প্রথম প্রেমস্বরূপ ভীষণ শেল উৎপাটিত হইল, কিন্তু অনেক দিনে, অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমে সে ফললাভ হইল। সেই পরিশ্রম ও চেষ্টায় যৌবনের প্রফুল্লতা শুষ্ক হইয়া গেল। অবয়বে চিন্তার রেখা অঙ্কিত হইল। হেমলতা আজি আর দুঃখিনী নহে, কিন্তু স্বভাবত ধীর, নম্র ও নতশির।

এক্ষণে হেমলতা ও শৈবলিনী সর্বদাই নরেন্দ্রের কথা কহিত, বাল্যকাল হইতে শৈবলিনী নরেন্দ্রকে ভ্রাতা বলিত, এখন যেমন তাহাকে ভ্রাতার স্বরূপ জ্ঞান করিত। ভ্রাতার বিপদে বা অবর্তমানে ভগিনীর চিন্তা হয়, হেমও নরেন্দ্রের জন্য ভাবিত, কিন্তু তাহার হৃদয় আর পূর্ববৎ বিচলিত হইত না; কিম্বা যদি কখন কখন সায়ংকালে এই উপবনে একাকিনী বিচরণ করিতে করিতে হেমের বাল্যকালের কথা মনে পড়িত, ভাগিরথীর কল্-কল্ শব্দ শুনিয়া, নীল গগনমণ্ডলে উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিয়া, শীতল হরিৎ কুঞ্জবনে উপবেশন করিয়া, বাল্যকালের সঙ্গীত-কথা মনে পড়িত, যদি সে কথা মনে পড়িয়া হেমের চক্ষে একবিন্দু জল লক্ষিত হইত,—পাঠক, তাহা ভ্রাতৃস্নেহের নিদর্শন স্বরূপ বলিয়া মার্জনা করিও। অন্য ভাব তিরোহিত করিবার জন্য হেম অনেক চেষ্টা করিয়াছে, অনেক

সহ্য করিয়াছে, অভাগিনী অনেক কাঁদিয়াছে, সে ভাব তিরোহিত হইয়াছে, যদি হৃদয়ের কন্দরে অজ্ঞাতরূপে সে ভাবের একবিন্দুও লুক্কায়িত থাকে, পাঠক, সেটুকু অভাগিনী হেমকে ক্ষমা করিও।

॥ উনত্রিশ ॥

ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া হেমলতা ও শৈবলিনী গৃহের সমস্ত কার্যাদি সমাপন করিল। পরে দুইজনে একটি ঘরে বসিলে হেম বলিল, "দিদি! অনেকদিন অবধি গল্প শুনি নাই, আজ একটু অবসর আছে, একটি গল্প বল।"

শৈবলিনী সস্নেহ বচনে উত্তর দিল, "বলিব বৈকি বৌ, কোন্ গল্পটি বলিব বল।"

হেম বলিল, "রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প অনেকদিন শুনি নাই, সেই গল্প বল।"

শৈবলিনী হরিশ্চন্দ্রের গল্প বলিতে লাগিল। মহাভারতের কথা যথার্থই অমৃতের তুল্য, তাহার গল্প কি মিষ্টি, কি সুললিত, কি হৃদয় গ্রাহী! রাজার রাজ্য গেল, ধন গেল, মান গেল, স্ত্রী পুত্র লইয়া রাজা বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাজমহিষী শৈব্যা এক্ষণে রাজার একমাত্র রত্ন। সুখের সময়, সম্পদের সময়, রমণী অস্থিরা, চঞ্চলচিত্তা, মানিনী। কত আব্দার করে, কত অভিমান করে, কত মিথ্যা ক্রোধ করে। কিন্তু যখন জীবনাকাশ ক্রমশঃ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আইসে, যখন পৃথিবীর সমস্ত সুখ নাট্যাভিনয়ের শেষে দীপশ্রেণীর ন্যায় একে একে নির্বাপিত হইতে থাকে, যখন আশা মরীচিকারূপে আমাদিগকে অনেক পথ লইয়া যাইয়া শেষে মরুভূমিতে রাখিয়া অদৃশ্য হয়, যখন বন্ধুগণ আমাদিগকে ত্যাগ করে ও লক্ষ্মী বিমুখ হয়, তখন কে অনন্যমনা ও অনন্যহৃদয়া হইয়া অভাগার শুশ্রূষা করে? মাতা ব্যতীত আর কে হতভাগার শয্যা রচনা করে? দুহিতা ব্যতীত আর কে রোগীর শুষ্ক ওষ্ঠে জলদান করে? ভার্যা ব্যতীত আর

কে নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া ক্লান্তি বিস্মৃত হইয়া দিবানিশি হতভাগার সেবায় রত থাকে? রমণীর প্রেম অগাধ, অপরিসীম। দারিদ্রে দুঃখে-কষ্টেও শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রকে সেবা করিতে লাগিলেন। সে দুঃখের কথা শুনিয়া হেমলতার চক্ষুতে জল আসিল।

তাহার পর আরও দুঃখ। রাজা শৈব্যাকে ও পুত্রটিকে বিক্রয় করিলেন, আপনাকে চণ্ডালের নিকট বিক্রয় করিলেন, অভাগিনী শৈব্যা স্বামীবিরহে কায়িক পরিশ্রমে আপনার ও পুত্রটির ভরণ-পোষণ করিতে লাগিলেন। আহা! সেই পুত্রটি অকালে কাল প্রাপ্ত হইল!—হেমলতা আর থাকিতে পারিল না, ননদিনীর হৃদয়ে মস্তক স্থাপন করিয়া দরবিগলিত ধারায় রোদন করিতে লাগিল।

গল্প সাঙ্গ হইল, রাজা রাজ্ঞীকে ফিরিয়া পাইলেন, পুত্রকে ফিরিয়া পাইলেন, রাজ্যসম্পদ সমস্তই ফিরিয়া পাইলেন। হেমলতার হৃদয় শান্ত হইল; অনেকক্ষণ, প্রায় এক দণ্ডকাল, উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পর হেমলতা ধীরে ধীরে উঠিয়া একটি বাতায়ন খুলিল। বাহিরে চন্দ্রকরে জগৎ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, নৈশ বায়ুতে বৃক্ষসকল ধীরে ধীরে মস্তক নাড়িতেছে, দূর হইতে গঙ্গার জলের কুল্-কুল্ শব্দ শুনা যাইতেছে।

শৈবলিনী ধীরে ধীরে হেমলতার নিকট আসিয়া ভগিনীর ন্যায় সস্নেহে তাহার হস্ত ধারণ করিল। হেম কি ভাবিতেছিল? ভাবিতে-ছিল, ঐ বৃক্ষের পাতায় পাতায় কত জোনাকি পোকা দেখা যাইতেছে, উহাদেরও জীবন আছে, সুখ দুঃখ ভরসা ইচ্ছা আছে। যে ভগবান রাজা হরিশ্চন্দ্রকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, তিনিই এই নিশায় অনিদ্র হইয়া ঐ পোকাগুলিকে খাদ্য যোগাইতেছেন, উহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। এই বিপুল বিশ্বসংসারে সকল জীবজন্তুকে তিনিই রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে নিবিষ্টমনে পূজা করি, আমাদিগকে তিনি রক্ষা করিবেন।

হেমলতা বালিকাসুলভ সরলতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, যিনি দয়ার সাগর, তিনি তোমাকে অল্পবয়সে বিধবা করিলেন কেন?"

শৈবলিনী। সকলের কপালে কি সকল সুখ থাকে? তিনি আমাকে বিধবা করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখিনী করেন নাই। দেবতুল্য ভ্রাতা দিয়াছেন, তোমার ন্যায় সুশীলা ভ্রাতৃজায়া দিয়াছেন, এই সোনার সংসারে স্থান দিয়াছেন। আমার আর কিছুই কামনা নাই, কেবল একবার তীর্থভ্রমণ করিয়া পূজা করিব, এই ইচ্ছা আছে।

হেমলতা। আমাদের কাশী বৃন্দাবন যাওয়ার কথা স্থির হইয়াছিল না?

শৈবলিনী। হ্যাঁ, শ্রীশ আমার উপরোধে সম্মত হইয়াছে, বোধ হয় শীঘ্রই যাওয়া হইবে।

হেমলতা। দিদি, তোমার সঙ্গে তীর্থে যাইব, ভাবিলে আমার বড় আহ্লাদ হয়; কত দেশ দেখিব, কত তীর্থ করিব। আর শুনিয়াছি নরেন্দ্র নাকি পশ্চিমে আছেন, হয়ত তাঁহার সঙ্গেও দেখা হইবে।

শৈবলিনী। হইতে পারে।

এমন সময়ে শ্রীশচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিলেন। শৈবলিনী একপার্শ্ব দিয়া বাহির হইয়া যাইল। তাহার ললাট চিন্তাকুল।

শৈবলিনীর কি চিন্তা? বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া শৈবলিনী ভাবিতেছিল, "হেম! তুমি আমাকে বিধবা ভাবিয়া অভাগিনী বল, কিন্তু নারীতে যাহা কখনও সহ্য করিতে পারে না, বালিকা! তুমি তাহা সহ্য করিয়াছ। সে আঘাতে তোমার হৃদয় চূর্ণ হইয়াছে, তোমার জীবন শুষ্ক হইয়াছে, এ বয়সে তোমার দুর্বল শরীর ও নীরস ওষ্ঠ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এ বিষম চিন্তার কথা ভ্রাতা কিছুই জানে না, তুমি বালিকা, তুমিও ভাবিয়াছ, এ চিন্তা নির্বাপিত হইয়াছে, কিন্তু নরেন্দ্রের সহিত আবার সাক্ষাৎ হইলে কি হয় জানি না। ভগবান অনাথার নাথ, অসহায়ের সহায় হইবেন।

শৈবলিনী পুনরায় ঘরের ভিতর আসিল ও ভ্রাতাকে আসন দিয়া ভোজনে বসাইয়া, আপনি পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতে লাগিল। হেমলতা সে ঘর হইতে বাহির হইয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বামীর ভোজন দেখিতে লাগিল।

ভ্রাতা-ভগিনীতে অনেকক্ষণ কথোপকথন হইতে লাগিল। অবশেষে শ্রীশচন্দ্রের খাওয়া সাঙ্গ হইল। রাত্রি অধিক হওয়ায় তিনি শয়নের উদ্যোগ করিলেন, শৈবলিনী অন্য গৃহে গেল।

তখন হেমলতা ধীরে ধীরে স্বামীর পার্শ্বে আসিল ও বিনীতভাবে তাম্বুল দিল। অদ্য শ্রীশের অন্তঃকরণ কিছু আহ্লাদিত ছিল, তিনি রহস্য করিয়া বলিলেন, "আমি পান খাইব না।"

হেম। কেন?

শ্রীশ। তোমার মুখে কথা নাই কেন?

হেম। কি কথা কহিব বল, কহিতেছি। আগে পানটি খাও।

শ্রীশ। চিরকালই কি এই শুষ্ক মুখখানি দেখিব? কবে তুমি শরীরে একটু সারিবে, কবে তোমার মুখখানি প্রফুল্ল দেখিব?

হেম। আমার শরীর ত এখন ভাল আছে।

শ্রীশ। হ্যাঁ, ঈশ্বরেচ্ছায় শরীর অল্প সারিয়াছে, কিন্তু মনে উল্লাস কৈ?

হেম। উল্লাস আবার কি?

শ্রীশ। মনের স্ফূর্তি কই? কবে তোমাকে সুখী দেখিব?

হেম। কৈ, আমার মনে ত কোন কষ্ট নাই। তবে দিদির কাছে একটি দুঃখের গল্প শুনিতেছিলাম, তাই একবিন্দু চক্ষের জল ফেলিয়াছিলাম।

শ্রীশ এ কথায়ও তুষ্ট হইলেন না; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মুখখানি সহাস্য দেখিব কবে?"

হেম আর উত্তর করিতে পারিল না, ভূমির দিকেই চাহিয়া রহিল। হঠাৎ একটি কথা মনে পড়িল, এবার হেম অল্প হাসিয়া বলিল, "যবে তুমি আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিবে।"

শ্রীশ। কি প্রতিজ্ঞা?

হেম। তীর্থযাত্রা।

শ্রীশচন্দ্র এবার কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। হেমলতা ও শৈবলিনীর উপরোধে অনেকবার তীর্থযাত্রা করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন উদ্যোগ করেন নাই। অদ্য হেমলতার কথায় কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে বলিলেন, "যদি যথার্থই তীর্থযাত্রা করিলে তোমার শরীর ও মন ভাল থাকে, তাহা হইলে আমি অবশ্যই যাইব। কল্য হইতেই আমি যাত্রার আয়োজন করিব"

হেম পরিতৃপ্ত হইল। হেমকে একটু প্রফুল্ল দেখিয়া শ্রীশ আনন্দিত হইলেন, সে ক্ষীণ দেহলতা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সস্নেহে হেমকে চুম্বন করিলেন।

উপরি-উক্ত ঘটনার অল্পদিন পরেই শ্রীশচন্দ্র সপরিবারে পশ্চিমযাত্রা করিলেন। গঙ্গাতীরস্থ সমস্ত তীর্থস্থান দেখিয়া অবশেষে মথুরা ও বৃন্দাবন যাইবার মানসে আগ্রায় পৌঁছিলেন। তথায় শ্রীশচন্দ্র প্রধান প্রধান হিন্দুরাজাদিগের সহিত আলাপ করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন রাজার উপরোধে শ্রীশ সেই রাজার পরিবারের সহিত আপন পরিবারকে নওরোজার দিন প্রাসাদে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হেমলতা অগত্যা রাজপুত-মহিলার বেশ ধরিয়া রাজপুত রমণীদিগের সহিত আগ্রার বেগমমহলে গিয়াছিলেন।

নরেন্দ্র আগ্রা-দুর্গের ভিতরে দর্পণে হেমলতার মুখচ্ছবি দেখিয়া প্রায় হতজ্ঞান হইয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। অনেকক্ষণ পরে নিস্তব্ধ আকাশ ও শান্ত-প্রবাহিণী নদীর দিকে চাহিতে চাহিতে ধীরে ধীরে আপন গৃহে যাইলেন।

নরেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন. একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, লোক কেহ নাই। নরেন্দ্র দ্বার রুদ্ধ করিয়া স্ত্রীলোকের বস্ত্র খুলিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার বক্ষস্থল হইতে একখানি পত্র ভূমিতে পড়িয়া যাইল, নরেন্দ্র তুলিয়া দেখিলেন উহা উর্দু ভাষায় লিখিত। নরেন্দ্র প্রদীপের নিকট বসিয়া পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। অধিক না পড়িতে পড়িতে বুঝিতে পারিলেন, জেলেখার পত্র। তখন অধিকতর বিস্মিত হইয়া আরও পড়িতে লাগিলেন। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল :

"নরেন্দ্র !

আমি পাগলিনী, আমি হতভাগিনী, সেইজন্য এই পত্র লিখিতেছি। আমি চক্ষুতে আর দেখিতে পাইতেছি না, আমার মস্তক ঘুরিতেছে. তথাপি মৃত্যুর পূর্বে একবার মনের কথা তোমাকে বলিয়া যাই। তুমি যখন এই পত্র পড়িবে, তখন অভাগিনী আর এ জগতে থাকিবে না।

আমি শাজাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা জেহান আরা বেগমের পরিচারিকা। যেদিন বারাণসীর যুদ্ধ হয়, কার্যবশত আমি ও মসরুর নামক খোজা রাজা জয়সিংহের শিবিরে ছিলাম। যেইদিন আহত ও অচেতন হইয়া তুমি সেই শিবিরে আনীত হও, সেইদিন তোমাকে দর্শন করিয়া হৃদয়ে কালসর্প ধারণ করিলাম।

দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, আমি হলাহল পান করিতে লাগিলাম। অশ্রান্ত হইয়া সেই পীড়াশয্যার উপর নত হইয়া

থাকিতাম, অনিদ্রিত হইয়া সেই নিদ্রিত কলেবর নিরীক্ষণ করিতাম। ঐ প্রশস্ত ললাট, ঐ রক্তবর্ণ ওষ্ঠ দুটির দিকে দেখিতাম আর পাগলিনী-প্রায় হইতাম। পীড়াবশত যখন তুমি আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিরস্কার করিতে, আমি নিঃশব্দে মনের দুঃখে রোদন করিতাম। পীড়াবশত যখন সস্নেহে আমার হস্ত ধরিতে, আমি পাগলিনী, আমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইত। ঘরে কেহ না থাকিলে আগ্রহের সহিত তোমাকে চুম্বন করিতাম। ক্ষমা কর, আমি পাগলিনী।

ক্রমে বারাণসী হইতে নৌকাযোগে তুমি দিল্লীতে আনীত হইলে। আমি কোন ছলে তোমাকে রাজপ্রাসাদের ভিতরে আনিয়া আপন ঘরে রাখিলাম; কেবল তোমাকে চক্ষে দেখিবার জন্য আপন ঘরে রাখিলাম। তোমাব মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া রজনী যাপন করিতাম; কখন কখন আত্মসংযম করিতে না পারিলে তোমার সংজ্ঞাশূন্য দেহ হৃদয়ে ধারণ করিতাম।

দুষ্ট মসরুর তোমার কথা সাহেব-বেগমকে জানাইল। প্রাসাদের ভিতরে পুরুষ আনিয়াছি শুনিয়া তিনি আমার ও তোমার প্রাণ সংহারের আদেশ দিলেন। আবার মসরুর যাইয়া সাহেব-বেগমকে তোমার অপূর্ব বীরত্ব ও অপূর্ব সৌন্দর্যের কথা বলিল। বেগম পূর্বের আজ্ঞা রোধ করিলেন, আমাকে ঘরে বন্দী করিয়া রাখিলেন ও তোমার আরোগ্যের পর স্বয়ং আমাদের দোষের বিচার করিবেন, সেইরূপ আদেশ দিলেন।

আমি বন্দী হইলাম, দিবারাত্রি ঘরে একাকিনী বসিয়া থাকিতাম; তোমাকে না দেখিয়া অসহ্য যাতনা হইত। অবশেষে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া দ্বাররক্ষক ও মসরুরকে অনেক খোসামোদ করিয়া গোপনে তোমাকে দেখিতে যাইতাম। তখন তুমি আরোগ্যলাভ করিয়াছ, কখন কখন আমার দিকে চাহিয়া দেখিতে, তাহা কি স্মরণ হয়? আমি অধিকক্ষণ থাকিতে পারিতাম না, কথা কহিতে পারিতাম না। নিষ্ঠুর মসরুর আমাকে শীঘ্রই আপন ঘরে পাঠাইয়া দিত, তথায় যাইয়া আমি আবার সেই দেবকান্তির চিন্তা করিতাম।

ক্রমে বিচারের দিম সমাগত হইল; সেদিন তোমার স্মরণ আছে? সিংহাসনোপবিষ্ট জেহান-আরার চারিদিকে সহচরীগণ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা তোমার স্মরণ আছে? সাহেব-বেগম সেইদিন প্রথমে তোমাকে দেখিলেন; যে কঠোর আজ্ঞা দিলেন, তোমার স্মরণ আছে? শাহাজাদি! আমার পাপের কি এই উচিত দণ্ড? তুমিও স্ত্রীলোক, তোমার হৃদয় কি পাষাণ, কখনও বিচলিত হয় নাই? তবে আমি বাঁদী, আমার স্বাধীনতা নাই, সেইজন্য আমার পাপের দণ্ড দিলে! কিন্তু তুমি সিংহাসনোপবিষ্টা রাজ-দুহিতা, আমা অপেক্ষাও যে ঘোর পাপীয়সী, তাহার কি দণ্ড নাই?

কি কৌশলে সেই রাত্রে আমি দুর্গ হইতে তোমাকে লইয়া পলায়ন করিলাম, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। তাহার পরই সৈনিকবেশে তুমি দিল্লী ত্যাগ করিলে, এই অভাগিনীও দেওয়ানা নাম ধারণ করিয়া পুরুষবেশে তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইল। নরেন্দ্র! তোমার প্রণয়ভাজন হইব, এরূপ আশা হৃদয়ে ধারণ করি নাই, দিবারাত্রি তোমার নিকটে থাকিব, দিবারাত্রি তৃষ্ণার্ত চাতকের ন্যায় তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব, দিবসে তোমার অমৃত-কথা শ্রবণ করিব, রজনীতে সন্ধ্যা হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত, কখন কখন দ্বিপ্রহর হইতে প্রভাত পর্যন্ত তোমার সুপ্ত কান্তি দেখিয়া হৃদয়ের পিপাসা নিবারণ করিব, কেবল এই আশায় আমি তোমার সহিত দিল্লী হইতে সিপ্রাতীরে, সিপ্রাতীর হইতে রাজস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। জগতে কোন্ স্থল আছে, নরকে কোন্ স্থল আছে, যেথায় এই সুখের আশায় অভাগিনী যাইতে পরাঙ্মুখ?"

"নরেন্দ্র! ভালবাসিয়াছি। যে হিন্দুরমণী তোমার প্রণয়ের পাত্রী, তাহাকেও আমি দেখিয়াছি। কিন্তু তুমি কখনও ভালবাসার জন্য দেওয়ানা হও নাই। আমার তাতারদেশে জন্ম, তথাকার সকলেই উগ্রস্বভাব, আমিও বাল্যকাল হইতেই অতিশয় উগ্রস্বভাবা ছিলাম। আমি ক্রুদ্ধ হইলে বালকগণও ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া বালিকার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইত। একটি যুদ্ধে আমার পিতা হত হয়েন, আমি রুদ্ধ হইয়া বাঁদী অবস্থায় দিল্লীর সম্রাটের নিকট বিক্রীত হইলাম। স্বাধীনতা গেল, কিন্তু উগ্রস্বভাব গেল না। বোধ হয়, ভারতবর্ষের উষ্ণতর সূর্যতাপে আমার শোণিত ক্রমশ উষ্ণতর হইল। প্রাসাদে তাতার-রমণীদিগের কি কাজ, বোধ হয় তুমি জান না। আমরা বেগমদিগের মহল রক্ষা করি, খড়্গ ও ছুরিকা ব্যবহারে আমরা অপটু নহি, বেগমদিগের আদেশে কত শত ভয়ঙ্কর কার্য সম্পাদন করি, তাহা জগৎসাধারণ কি জানিবে? আমি এ সমস্ত ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া সকলের অসাধ্য কার্যও সাধন করিতাম। আমার এই গুণের জন্যই সাহেব বেগম আমার এরূপ ক্রোধ সহ্য করিতেন।

যখন দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া আমি তোমার সহিত আসিলাম, আমার স্বভাব কিছুমাত্র অন্যথা হইল না, দেওয়ানা হইয়া তোমার সহিত আসিলাম।

উদয়পুরের হ্রদে নৌকা করিয়া সন্ধ্যার সময় চন্দ্রালোকে বেড়াইতে যাইতে স্মরণ হয়? তোমাকে সর্বদাই চিন্তিত দেখিতাম, কিন্তু তুমি কি ভাবিতে, স্থির করিতে পারিতাম না। একদিন আমি নৌকায় বসিয়াছিলাম, তুমি আমার অঙ্কে মস্তক রাখিয়া শুইয়াছিলে ও চন্দ্রের দিকে দেখিতেছিলে, স্মরণ হয়? আমি সমস্ত সময় তোমার চন্দ্রকরোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম, তোমার

কেশবিন্যাস করিয়া দিয়াছিলাম, তোমার অঙ্গুলি লইয়া খেলা করিতেছিলাম। সহসা তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলে, 'হেম! আর কি তোমাকে এ জীবনে দেখিতে পাইব?' আমি বঙ্গভাষা ভাল জানি না, কিন্তু এ কথা বুঝিলাম। আমার মনে সন্দেহ জাগ্রত হইল।

স্ত্রীলোকের মনে একবার সন্দেহ উদয় হইলে তাহা শীঘ্র তিরোহিত হয় না। দিবারাত্র তোমার হেমের কথা জানিতে উৎসুক থাকিতাম, তোমার কাগজপত্র চুরি করিয়া পড়িয়া লইতাম কথায় কথায় তোমার নিকট হইতে জীবনের সমস্ত কথা বাহির করিয়া লইলাম। তখন তোমার হেমকে তোমার মন হইতে দূর করিয়া সেই স্থান অধিকার করিবার জন্য আমার হৃদয় জ্বলিতে লাগিল।

তোমার হিন্দুধর্মে আস্থা দেখিয়া আমি একলিঙ্গ-মন্দিরের গোস্বামীদিগের নিকট আপনার ইষ্টলাভের জন্য যাইলাম। প্রথমে যাঁহার নিকট যাইলাম, তিনি পরম তেজস্বী ও ধার্মিক আমার সমস্ত প্রস্তাব শুনিয়া আমাকে পদাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। এইরূপে তিন চারিজনের নিকট অপমানিত হইয়া অবশেষে সেই শৈলেশ্বরের নিকট যাইলাম। তিনি অনেক অর্থলোভে সম্মত হইলেন। আমি তৎক্ষণাত তিন শত মুদ্রার একটি হীরক বলয় তাঁহার হাতে দিলাম আর সহস্র মুদ্রার একটি মুক্তামালা তাঁহার সম্মুখে দোলাইয়া বলিলাম. 'যদি ছলে বলে কৌশলে নরেন্দ্রকে হেমলতার চিন্তা ত্যাগ করাইতে পার, মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করাইতে পার, আমাকে গ্রহণ করাইতে পার, তবে এই মুক্তাহার তোমার গলায় স্বহস্তে পরাইয়া দিব।"

এত অর্থ কোথায় পাইলাম, জিজ্ঞাসা করিবে। জেহান-আরার দাসদাসীরও অর্থের অভাব ছিল না। দেশের বড় বড় লোক সম্রাটের নিকট কোন আবেদন করিতে আসিলে বেগম-সাহেবকে উপঢৌকন না দিলে কোন কার্য্যই সম্পাদিত হইত না। কেহ

একটি উচ্চকর্মের প্রার্থী, কেহ একটি বিষয়ের প্রার্থী, কেহ প্রজার উপর অত্যচার করিয়াছেন, তাহার ক্ষমা চাহেন, কেহ পরের জায়গীর কাড়িয়া লইয়াছেন, তাহার একটি সনন্দপত্র চাহেন, কোন যোদ্ধা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছেন, তাহাব ক্ষমাপ্রার্থী, কাহারও উপর সম্রাটের অন্যায় ক্রোধ হইয়াছে, সে ক্রোধ হইতে নিস্তার পাওয়া আবশ্যক ; সকলেই রাশি রাশি হীরা, মুক্তা ও অর্থ বেগম-সাহেবার নিকট পাঠাইয়া দিয় আপন আপন আবেদন জানাইতেন। বেগম সাহেবাব দাসীরাও অর্থে বঞ্চিত হইত না।

তাহার পর শৈলেশ্বর যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তুমি জান। সে উপায় বিফল হইল, আমার আশা বিফল হইল। তুই দিন পর্বত গহ্বরে নিজে নারীবেশে তোমার সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলাম, তুমি সুধায় উন্মত্ত ছিলে, দেখিয়াছিলে কি না জানি না। প্রথম দিনে তোমার পদতলে পড়িয়া রোদন করিয়াছিলাম, দ্বিতীয় দিবস তোমার প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছিলাম। হস্ত হইতে খড়্গ পড়িয়া গেল, তাতারের হস্ত হইতে খড়্গ পড়িয়া যায়, কখনও জানিতাম না ; আমি এরূপ ক্ষীণ, তাহা জানিতাম না।

পরে তোমার সহিত পুনরায় আগ্রায় আসিলাম, অনুসন্ধানে জানিলাম, বঙ্গদেশ হইতে একজন ধনাঢ্য জমিদার আসিয়াছে, —তোমার হেমকে দেখিলাম। পাপিষ্ঠ! পরস্ত্রী তোমার হেম! উঃ আর যাতনা সহ্য করিতে পারি না। তিন দিন পর মথুরার গোলক নাথের মন্দিরে এক-প্রহর রাত্রির সময় যাইও, পরস্ত্রীকে আবার দেখিও! তুমি আমাকে হতভাগিনী করিয়াছ, তোমাকেও হতভাগা করিব, সেইজন্য এই সমাচার দিলাম। সেইজন্য আগ্রার দুর্গে লইয়া যাইয়া হেমকে দেখাইয়াছিলাম।

আমার মৃত্যু সন্নিকট, জিঘাংসা তাতারের ধর্ম, আমি স্বধর্ম ভুলি নাই, আমার শোণিত শীতল হয় নাই।

উঃ! আমার মস্তক ঘুরিতেছে। যদি এ তৃষ্ণাকে স্নেহবারি দান করিতে, তবে মুসলমানী অকৃতজ্ঞ হইত না, যতদিন জীবিত

থাকিত—কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি নরেন্দ্র! এ জীবনের জন্য বিদায় দাও, যদি মৃত্যুর পর আর একবার দেখা হয়, নিষ্ঠুর নরেন্দ্র! এই হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া অন্তরের ভাব তোমাকে দেখাইব। নরেন্দ্র! তখন তুমি আমাকে ভালবাসিবে, –নতুবা এই ছুরিকা দ্বারা তোমার পাষাণ হৃদয় চূর্ণ করিব।

—উন্মাদিনী জেলেখা”

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইল। নরেন্দ্রের নয়ন হইতে দুই-এক বিন্দু অশ্রুবারি পড়িল। তিনি নিস্তব্ধে চিন্তা করিতে করিতে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। রজনী প্রায় শেষ হইয়াছে, সমস্ত নগর নিস্তব্ধ। নরেন্দ্র পদচারণ করিতে করিতে অনেক দূর যাইয়া পড়িলেন, দেখিলেন সম্মুখে যমুনা।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নরেন্দ্র প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে দেখিলেন, যমুনাতীরে একস্থানে কতকগুলি লোক সমবেত হইয়া একটি মৃতদেহ ভূমিতে সন্নিবেশিত করিতেছে। জিজ্ঞাসা করায় সেই লোকের মধ্যে একজন উত্তর দিল, “মৃত ব্যক্তি পূর্বে বেগম মহলের দাসী ছিল। একজন কাফের সৈনিকের সহিত ব্যভিচারিণী হইয়া বাহির হইয়া যায়। বোধ হয়, সে সৈনিক উহাকে এক্ষণে হত্যা করিয়াছে দাসীর বক্ষস্থলে এই তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত বসান দেখিলাম। হতভাগিনার নাম জেলেখা।”

॥ তেত্রিশ ॥

সায়ংকালে শান্তপ্রবাহিনী যমুনাকূলে মথুরা নগরী বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। সূর্য অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছে, গগণে নক্ষত্র এক একটি করিয়া প্রস্ফুটিত হইতেছে, যমুনার বিশাল বক্ষের উপর দিয়া সন্ধ্যার বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে, সমস্ত জগৎ শীতল ও শান্ত। মথুরার প্রস্তর-বিনির্মিত ঘাটশ্রেণী জল পর্যন্ত

নামিয়াছে। বৃক্ষ ও কুঞ্জবনের ভিতর দিয়া মথুরার গোলোকনাথের মন্দির দেখা যাইতেছে।

ক্রমে রজনী অধিক হইল, হেমন্তকালের চন্দ্রালোকে নদী, গ্রাম, বৃক্ষ ও মন্দির অতি সুন্দরকান্তি ধারণ করিল। নীল গগনে সুধাংশু যেন ধীরে ধীরে ভাসিতেছে। নদীবক্ষে এই একখানি ক্ষুদ্র তরী ভাসমান রহিয়াছে। নদীর দুই পার্শ্বে নিবিড়কৃষ্ণ বৃক্ষশ্রেণী নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; বোধ হইতেছে যেন চন্দ্রের সুধাবর্ষণে সমগ্র জগৎ তৃপ্ত হইয়া সুখে নিদ্রিত রহিয়াছে।

সহসা নগরের মধ্যে সায়ংকালীন পূজা আরম্ভ হইল, শত শত দেবালয় হইতে শঙ্খ-ঘণ্টা নিনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। সায়ংকালীন বায়ুহিল্লোলে সুদূরশ্রুত সে নিনাদ কি সুমধুর, কি মিষ্টি! সেই ঘণ্টারব ধীরে ধীরে নদীর বক্ষে ও নগরের চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল, ধীরে ধীরে সেই নীল অনন্ত নৈশ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল, উপাসকদিগের মন যেন মুহূর্তের জন্যও পৃথিবীর চিন্তা বিস্মৃত হইয়া সেই পবিত্র ঘণ্টারবের সহিত গগনের দিকে প্রধাবিত হইতে লাগিল।

নদীকূলে একটি প্রস্তর-বিনির্মিত সোপানশ্রেণীর উপরেই গোলোক-নাথের মন্দির; সেই দেবমন্দিরে আরতি হইতেছিল। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও পূজক উচ্চৈঃস্বরে সায়ংকালীন গীত গাহিতেছিল, অনেক যাত্রী সে পূজায় উপস্থিত হইয়াছিল, যাত্রীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকই অধিক, বহু দূর হইতে, বহু দেশ হইতে এই পুণ্যস্থানে সমবেত হইয়া অদ্য মন্দির দর্শন করিয়া যেন জীবন চরিতার্থ করিল।

আরতি শেষ হইল, যাত্রিগণ নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল, কেবল দুইজন স্ত্রীলোক সেই মন্দিরপার্শ্বে একটি বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া কথোপকথন করিতেছিল।

হেমলতা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "দিদি, মুসলমানী বলিয়াছিল, আজ এই মন্দিরে এক প্রহর রাত্রির সময় নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইবে, কৈ, তাহা হইল না?"

শৈবলিনী অতিশয় বুদ্ধিমতী, হেমের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিল যে, যদিও হেম হাসিতে হাসিতে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল, তথাপি হেমের হৃদয় যথার্থই উদ্বেগে পরিপূর্ণ। সেই আশায় হেমের হৃদয় আজি সজোরে আঘাত করিতেছে, হেমের শরীর এক একবার অল্প অল্প কম্পিত হইতেছে।

শৈবলিনী মনে মনে ভাবিল, আজ না জানি কি কপালে আছে; হেম বালিকা মাত্র, নরেন্দ্রকে দেখিলে আবার পূর্বকথা মনে করিবে, সে অসহ্য যাতনা বালিকা কি সহ্য করিতে পারিবে? প্রকাশ্যে বলিল, "সে পাগলিনীর কথায় কি বিশ্বাস করে? নরেন্দ্র কোথায় কোন্ দেশে আছে, তাহার সহিত মথুরায় দেখা হইবার আশা করিতেছ?"

হেমলতা। কিন্তু দিদি, জেলেখার অন্য কথাগুলি ত ঠিক হইয়াছিল!

শৈবলিনী। ঐ প্রকারে উহারা মিথ্যা আশা জন্মায়; দু'টা সত্য কথা বলে, একটা মিথ্যা কথা বলে। কৈ, আমাদের দাসী আসিল না? আমি যে পথ ঠিক চিনি না, না হইলে আমরা দুইজনেই বাড়ি যাইতাম।

হেম। দেখ দিদি, আমার বোধ হইতেছে, যেন এই আমাদের গৌরনগর, যেন এই গঙ্গা। আর বাল্যকালে চন্দ্রালোকে গঙ্গাতীরে খেলা করিতাম, তোমার সহিত খেলা করিতাম, আর—আর আর, সকলের সহিত খেলা করিতাম, সেই কথা মনে পড়িতেছে।

শৈবলিনীর মুখ আবার গম্ভীর হইল, দাসীর আসিতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া শৈবলিনী যৎপরোনাস্তি উৎসুক হইল। হেম তাহা লক্ষ্য না করিয়া আবার বলিতে লাগিল, "দেখ দিদি, ঐ নৌকাখানি কেমন তীরের মত আসিতেছে। উঃ? মাঝিরা কি জোরে দাঁড় বাহিতেছে! উঃ! যেন উড়িয়া আসিতেছে!"

শৈবলিনী সেইদিকে দেখিল; তাহার ভয় দ্বিগুণ হইল। শৈবলিনী যাহা ভয় করিতেছিল, তাহাই হইল,—নৌকা ঘাট হইতে

চারি হস্ত দূরে থাকিতে একজন সৈনিক লম্ফ দিয়া ঘাটে পড়িল, সৈনিক নরেন্দ্রনাথ!

হেম বৃক্ষের ছায়ায় ছিল, নরেন্দ্র তাহাকে না দেখিতে পাইয়া মন্দিরের ভিতর যাইলেন। কিন্তু হেম নরেন্দ্রকে দেখিয়াছিল, সেই মুহূর্তে যেন শরীরের সমস্ত রক্ত হেমের মুখমণ্ডলে দৃষ্ট হইল; চক্ষু, কর্ণ ললাট, স্কন্ধ একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া গেল। পর-মুহূর্তে সমস্ত মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, ললাট হইতে স্বেদবিন্দু বহির্গত হইতে লাগিল।

শৈবলিনী সভয়ে হেমকে ধরিল। হেম কিঞ্চিত আরোগ্যলাভ করিলে শৈবলিনী গম্ভীরস্বরে বলিল,—"হেম, আমি তোমাকে ভগিনী অপেক্ষা ভালবাসি। আমি বলিতেছি, আজ নরেন্দ্রের সহিত দেখা করিও না, বাড়ি চল। তুমি আমাকে ভগিনী অপেক্ষা ভালবাস, আমার এই কথাটি শুন, বাড়ি চল। তুমি বালিকা, আপনার মন জান না, নরেন্দ্রের সহিত অদ্য তোমার কথোপকথন হইলে কি বিপদ ঘটিবে, ভগবান জানেন।"

হেমলতা মুখ নত করিয়া এই কথা শুনিল, অনেকক্ষণ ভূমির দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিল, নয়ন হইতে দুই এক বিন্দু স্বচ্ছ অশ্রু স্বচ্ছ বালুকায় পড়িয়া অদৃশ্য হইল। আবার ধীরে ধীরে মুখখানি তুলিল। তখন উদ্বেগের লেশমাত্র চিহ্ন নাই; হেমের মুখখানি শান্ত, নির্মল, স্থির। নয়নে কেবল একবিন্দু অশ্রুজল।

হেম শৈবলিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, "দিদি, তুমি আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিও না। দিনে দিনে, মাসে মাসে, তুমি আমাকে কত ধর্ম উপদেশ দিয়াছ, আমি তাহা ভুলি নাই। দিদি, আমি অবিশ্বাসিনী নহি। আজি এইমাত্র দেবপূজা সাঙ্গ করিলাম, এই পুণ্যভূমিতে দাঁড়াইয়া এই পুণ্য দেবমন্দিরে আমি অবিশ্বাসিনী হইব না। যদি আমার প্রধান দেবতা, দেবতুল্য স্বামী আমাকে ভালবাসেন, আমার জীবনের যিনি সর্বস্বধন, জীবন থাকিতে এ দাসী তাঁহার অবিশ্বাসিনী

হইবে না। দিদি, আমাকে সন্দেহ করিও না, আমাকে মন্দ ভাবিও না, তুমি আমাকে মন্দ ভাবিলে এ সংসারে অভাগিনীকে কে ভালবাসিবে ?”

হেমলতার নয়ন হইতে ঝর-ঝর করিয়া জল পড়িয়া সমস্ত মুখমণ্ডল সিক্ত হইতেছিল।

তখন শৈবলিনীর মন শান্ত হইল, শৈবলিনীরও চক্ষুতে জল আসিল। শৈবলিনী সস্নেহে হেমের চক্ষু মুছাইয়া বলিল, “হেম, আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ধর্মপরায়ণা, তুমি পতিব্রতা, আমি যে মুহূর্তের জন্যও তোমাকে সন্দেহ করিয়াছিলাম, সেজন্য ক্ষমা কর।”

হেম। দিদি, তুমি ক্ষমা চাহিও না, তোমার দয়া, তোমার ভালবাসা, তোমার ঋণ আমি ইহজন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না। জন্মে জন্মে যেন তোমার ভগিনী হই, আর আমার কিছু প্রার্থনা নাই।

আবার দুইজনে দুইজনকে ধরিয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, দুইজনের চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। পরে শৈবলিনী বলিল, “রাত্রি হইতেছে, যাও, নরেন্দ্রের সহিত দেখা করিয়া আইস।”

শৈবলিনী সেই বৃক্ষতলে অপেক্ষা করিতে লাগিল, হেমলতা মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিল। হেমলতার এক্ষণে উদ্বেগ নাই, ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল ও নম্রভাবে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া রহিল।

এতদিনের পর হৃদয়ের হেমকে পাইয়া নরেন্দ্রের হৃদয় উদ্বেগপূর্ণ হইল। নরেন্দ্র কথা কহিতে পারিলেন না, কেবলমাত্র হেমের হাত ধরিয়া পিপাসিতের ন্যায় সেই অমৃতমাখা মুখখানি দেখিতে লাগিলেন, শরীর কাঁপিতে লাগিল। হেম আর সহ্য করিতে পারিল না, মস্তক নত করিয়া রহিল। তাহার নয়ন ছল্‌ছল্‌ করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পর হেমলতা নরেন্দ্রের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া বলিল, “নরেন্দ্র !”

নরেন্দ্র দেখিলেন, হেমের মুখে আর উদ্বেগের চিহ্ন নাই, লজ্জার চিহ্ন নাই, মুখমণ্ডল নির্মল ও পরিষ্কার। ধীরে ধীরে হেমলতা বলিল, "নরেন্দ্র!"

॥ চৌত্রিশ ॥

দেবালয়ের সমস্ত দীপ তখন নির্বাণ হইয়াছে ও সমস্ত লোক সুপ্ত অথবা চলিয়া গিয়াছে। স্তম্ভ ও প্রকোষ্ঠের উপর সুন্দর চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে ও সারি সারি স্তম্ভছায়া ভূমিতে পতিত হইয়াছে। পার্শ্বে বিশাল যমুনা নদী চন্দ্রকরে নিস্তব্ধে বহিয়া যাইতেছে ও রহিয়া রহিয়া শীতল যমুনার বায়ু মন্দিরের ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। সেই সুস্নিগ্ধ রজনীতে পবিত্র মন্দিরের একটি স্তম্ভছায়াতে নিস্তব্ধ নরেন্দ্র ও হেম দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

হেম স্থিরভাবে বলিল, "নরেন্দ্র! অনেকদিন পর আমাদের দেখা হইয়াছে, আবার বোধ হয়, অনেকদিন দেখা হইবে না, আইস, আমাদের মনের যে কথা, তাহাই কহি। নরেন্দ্র! বাল্যকালে আমরা দুইজনে গঙ্গাতীরে খেলা করিতাম, কত স্বপ্ন দেখিতাম। এক্ষণে তুমি সৈনিকের কার্যে ব্রতী হইয়াছ, আমি পরের স্ত্রী। নরেন্দ্র, বাল্যকালের স্বপ্ন একেবারে বিস্মৃত হও।"

হেমলতা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, আবার বলিল, "বিধাতা যদি অন্যরূপ ঘটাইতেন, তবে আমাদের জীবন অন্যরূপ হইত, বাল্যকালের স্বপ্ন সফল হইত। কিন্তু নরেন্দ্র, আমরা যেন ভ্রমেও বিধাতার নিন্দা না করি। যিনি তোমাকে পরাক্রম দিয়াছেন, যশ দিয়াছেন, তাঁহার নাম লও, অবশ্য তোমাকে সুখী করিবেন। যিনি আমাকে এই সংসারে স্থান দিয়াছেন, দেবতুল্য স্বামী দিয়াছেন, শৈবলিনীর ন্যায় ননদিনী দিয়াছেন, ধন-ঐশ্বর্য দিয়াছেন, তিনি দয়ার সাগর, তাঁহাকে আমি প্রণাম করি।"

হেমলতা গলায় বস্ত্র দিয়া করযোড়ে বিশ্বের আদি-পুরুষকে

লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিল। তাহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, পবিত্র, শান্তি-রসে পরিপূর্ণ।

নরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া হেমলতার মুখের দিকে চাহিল, তাহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না। হেমলতা আবার বলিতে লাগিল, "নরেন্দ্র, আমি শুনিয়াছি, তুমি অনেক যুদ্ধ করিয়াছ, অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছ, সকল দেশেই সুখ্যাতি লাভ করিয়াছ। তুমি পুণ্যাত্মা, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন। কিন্তু যদি যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম আকাঙ্ক্ষা কর যদি বিপদ বা দারিদ্রে পতিত হও, আবার বীবনগরে যাইও, তুমি যাইলে সকলেই আহ্লাদিত হইবে। আমার স্বামীর হৃদয় আমি জানি, তিনি তোমাকে কনিষ্ঠের ন্যায় ভালবাসেন, সর্বদাই সস্নেহে তোমার কথা কহেন, তুমি যাইলেই তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইবেন।"

নরেন্দ্র নিস্তব্ধ হইয়াছিল, হেমের কথাগুলি তাঁহার কর্ণে অপূর্ব সঙ্গীতধ্বনির ন্যায় বোধ হইতেছিল। তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ, তাঁহার নয়ন দুটিও পরিপূর্ণ।

হেম আবার বলিতে লাগিল, "আর তুমি যাইলে শৈবলিনীও কত আহ্লাদিত হইবেন। আর হেমলতা যতদিন জীবিত থাকিবে, কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় তোমার সেবা-শুশ্রূষা করিবে। ভাই নরেন্দ্র! আমি তোমাকে যখন দেখিব, তখনই আহ্লাদিত হইব"

এই স্নেহবাক্য শুনিয়া নরেন্দ্রের চক্ষুতে আবার জ আসি , আবার দুইজনে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

শেষে হেম ঈষৎ গম্ভীরস্বরে বলিল "নরেন্দ্র, আর একটি কথা আছে, কিছু মনে করিও না, আমার দোষ গ্রহণ করিও না। নরেন্দ্র, আমাদের বিদায়কালে প্রণয় চিহ্নস্বরূপ আমাকে একটি দ্রব্য দিয়াছিলে, সেটি এখন পরিধান করিতে আমি অধিকারিণী নহি। নরেন্দ্র, সেটি ফিরাইয়া লও।"

হেমলতা আপন হস্তের বস্ত্র তুলিয়া লইল, নরেন্দ্র দেখিল, যে মাধবীকঙ্কন নরেন্দ্র দিয়াছিল, তাহা এখনও রহিয়াছে। লতা শুষ্ক

হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে, হেমলতা সেই অসংখ্য খণ্ডকে একে একে সুতার দ্বারা গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিল অদ্য তাহাই পরিধান করিয়া আসিয়াছে।

উভয়ের পূর্বকথা মনে আসিতে লাগিল, উভয়ের হৃদয় বিষাদ-চ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হইল, উভয়েই অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। নরেন্দ্র হেমলতার সেই সুন্দর বাহু ও সেই মাধবী কঙ্কন দেখিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার নয়ন জলে পরিপূর্ণ হইল, আর দেখিতে পারিলেন না। অবশেষে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুবারি পড়িয়া হেমলতার হস্ত ও বাহু সিক্ত করিল। অবশেষে নরেন্দ্র একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হেম, তবে কি জন্মের মত আমাকে বিস্মৃত হইবে?"

হেম বলিল, "জীবিত থাকিতে তোমায় বিস্মৃত হইব না; চিরকাল সহোদরের ন্যায় তোমার কথা ভাবিব। কিন্তু এই কঙ্কন অন্য প্রণয়ের চিহ্ন স্বরূপ আমাকে দিয়েছিলে, নরেন্দ্র আমি সে প্রণয়ের অধিকারিণী নহি। নরেন্দ্র মনে ক্লেশবোধ করিও না, আমি এই কয় বৎসর এ কঙ্কনটি পূজা করিয়াছি, হৃদয়ে রাখিয়াছি, উহা ত্যাগ করিতে আমার যে কষ্ট হইতেছে, তাহা তুমি জান না। কিন্তু এটি উন্মোচন কর, ইহাতে আমার অধিকার নাই। নরেন্দ্র, আমি অবিশ্বাসিনী স্ত্রী নহি।"

নরেন্দ্র আর কোন কথা কহিলেন না। নিঃশব্দে হেমলতার হস্ত হইতে কঙ্কন খুলিয়া লইলেন।

তখন হেমলতা বলিল, "নরেন্দ্র! আমি চলিলাম, তুমি ধর্ম-পরায়ণ, বাল্যকাল হইতে ধর্মে তোমার আস্থা আছে, সে ধর্ম কখনও বিস্মৃত হইও না, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখিবেন। তিনি যাহাকে যাহা করিয়াছেন, যেন আমরা সেইরূপ থাকিতেই চেষ্টা করি। পুষ্পটি দুই একদিন সুগন্ধ বিস্তার করিয়া শুষ্ক হইয়া যায়, পক্ষীটি আলোকে প্রফুল্ল হইয়া গান করে, তাহাদের সেই কার্য। নরেন্দ্র, তুমি বীরপুরুষ, শত্রুকে জয় কর, দেশের মঙ্গল কর, পদাশ্রিত

ক্ষীণের প্রতি দয়া করিও। আর ভগবান আমাকে দেবতুল্য স্বামী দিয়াছেন, তিনি আমার সহায় হউন, সেই স্বামীর যেন কখনও ত্রুটি না করি, সেই স্বামীতে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে, আমি যেন তাঁহারই চিরপতিব্রতা দাসী হইয়া থাকি। নরেন্দ্র! ভাই নরেন্দ্র! বাল্যকালে তুমি আমাকে ধর্মশিক্ষা দিয়েছিলে, এই পবিত্র দেবমন্দিরে আবার সেই শিক্ষা দাও। ভাই, আমরা প্রতিশ্রুত হই, ধর্মপথ কখনও ত্যাগ করিব না, আমি জনমে-মরণে চির-পতিব্রতা হইয়া থাকিব।"—কথা সাঙ্গ করিয়া হেমলতা দেবপ্রতিমূর্তির সম্মুখে প্রণতা হইল; নরেন্দ্রও নিঃশব্দে প্রণত হইলেন।

উঠিয়া আবার সযত্নে নরেন্দ্রের হাত ধরিয়া হেমলতা বলিল, "ভাই নরেন্দ্র, এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিদায় দাও, আমি চিরকাল তোমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিব, তুমিও তোমার কনিষ্ঠা ভগিনীকে মনে রাখিও।"

একবিন্দু জল নয়ন হইতে মোচন করিয়া হেমলতা ধীরে ধীরে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যতক্ষণ দেখা যাইল, নরেন্দ্র হেমের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর? তাহার পর এ জগতের মধ্যে নিতান্ত দুর্ভাগ্য লোকও নরেন্দ্রের সে রজনীর শোক ও বিষাদ দেখিলে বিষণ্ণ হইত। অভাগার হৃদয় আজ শূন্য হইল, অভাগার প্রণয়-ইতিহাস আজ সমাপ্ত হইল।

মাধবীকঙ্কনটি হৃদয়ে ধারণ করিয়া নরেন্দ্র যমুনাতীরে বসিয়া-ছিলেন। হেমলতার কথাগুলি তাঁহার মনে বার বার উদয় হইতে লাগিল—"এটি উন্মোচন কর, ইহাতে আমার অধিকার নাই, নরেন্দ্র, আমি অবিশ্বাসিনী পত্নী নহি।" নরেন্দ্রের কি সে প্রণয় নিদর্শনটি রাখিবার অধিকার আছে? সমস্ত রজনী নরেন্দ্র সেটি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিলেন, প্রাতঃকালে শূন্য হৃদয়ে সেটি বিসর্জন দিলেন, যমুনার জলে ভাসিতে ভাসিতে শুষ্ক কঙ্কনটি অদৃশ্য হইয়া গেল।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইল. কেবল আখ্যায়িকার নায়ক-নায়িকাদিগের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে বাকি আছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে. শাসুজা বঙ্গদেশে হইতে দ্বিতীয়বার যুদ্ধার্থে আগমন করিতেছিলেন। শীতকালে প্রয়াগের নিকট সুজা ও আওরংজীবের মধ্যে মহাযুদ্ধ হয়। দুই দিনের যুদ্ধের পর সুজা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন, যশোবন্তসিংহ এই যুদ্ধে আওরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহাযোদ্ধার অধিক ক্ষতি করিতে পারিলেন না, ক্ষোভে রাজস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

সুজা প্রয়াগ হইতে পাটনা, পাটনা হইতে মুঙ্গের, মুঙ্গের হইতে রাজমহল এবং তথা হইতে গঙ্গা পার হইয়া তণ্ডায় পলায়ন করিলেন। আওরংজীবের পুত্র মহম্মদ এবং সেনাপতি আমীর জুমলা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। তণ্ডায় রাজপুত্র মহম্মদ, সুজার কন্যাকে বিবাহ করিয়া সুজার পক্ষাবলম্বন করিলেন; কিন্তু উভয়েই আমীর জুমলার নিকট পরাস্ত হইলেন। তৎপরে মহম্মদ পিতার কপটপত্রে বিশ্বাস করিয়া সস্ত্রীক সুজার পক্ষ ত্যাগ করিলেন। অভাগা সুজা আরাকানে পলায়ন করিলেন। তথাকার রাজার সহিত বিরোধ হওয়ায় সুজা সসৈন্যে হত হইলেন, তাঁহার কন্যাকে রাজা বিবাহ করিলেন। কথিত আছে, সুজার রূপবতী সহধর্মিণী প্যারিবানু বিষাদে আত্মহত্যা করিলেন। যিনি বিংশতি বৎসর বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন, তিনি যুদ্ধে সাহস, শাসনে দয়া ও হিন্দুদিগের প্রতি বদান্যতার জন্য খ্যাত হইয়াছিলেন, যাঁহার রাজমহলের প্রাসাদ মর্ত্যে ইন্দ্রপুরী ছিল ও দিবারাত্র আনন্দলহরীতে ভাসিতেন, তিনি মৃত্যুকালে মস্তক রাখিবার স্থান পাইলেন না, বিদেশ শত্রুহস্তে সবংশে বিনষ্ট হইলেন।

দারা শ্যামনগর অথবা ফতে-আবাদের যুদ্ধে পরাজয়ের পর সিন্ধুদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন, আওরংজীবের সৈন্য তথা হইতে দারাকে দিল্লী লইয়া আইসে। নৃশংস সম্রাট্ ভ্রাতাকে যথেষ্ট অপমান করিয়া পরে হত্যা করেন। কারারুদ্ধ মোরাদও অচিরাৎ রাজাজ্ঞায় হত হইলেন। ভ্রাতৃরক্তে স্নাত হইয়া আওরংজীব ভারতবর্ষের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

যেদিন মথুরায় হেমের সহিত নরেন্দ্রের সাক্ষাত হইয়াছিল, তাহার পর নরেন্দ্র নিরুদ্দেশ হইলেন।

হেমলতা বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া নরেন্দ্রের অনেক অনুসন্ধান করাইলেন, মহানুভব শ্রীশচন্দ্র দেশে-দেশে সংবাদ পাঠাইলেন যে, নরেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেই তাঁহাকে তাঁহার পৈতৃক জমিদারীর অর্ধ-অংশ ছাড়িয়া দিবেন, কিন্তু সেইদিনের পর নরেন্দ্রকে আর কেহ কোথাও দেখিতে পাইল না।

হেমলতা বীরনগরে শ্রীশচন্দ্রের সহিত বাস করিতে লাগিলেন, মথুরা মন্দিরে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, হেম তাহা বিস্মৃত হয়েন নাই, পতিসেবায় ধর্মপরায়ণ হেমের অন্য চিন্তা তিরোহিত হইল, পতিভক্তি ভিন্ন অন্য ধর্ম তিনি জানিতেন না। ক্রমে শ্রীশচন্দ্রের ঔরসে তাঁহার হেমন্তকুমারী ও সরযূবালা নামক দুইটি কন্যা ও প্রতাপ নামক একটি পুত্র জন্মিল। বিংশতি বৎসর পূর্বে শ্রীশ, নরেন্দ্র ও হেমলতা সায়ংকালে গঙ্গাতীরে যেরূপ খেলা করিত বাষ্পোৎফুল্ললোচনে হেমলতা দেখিলেন, তাঁহার পুত্রকন্যাগণ সেইস্থানে সেইরূপ খেলা করিতেছে, দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, আনন্দধ্বনিতে চারিদিকের কুঞ্জবন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সংসারের এই গতি, এক দল যাইতেছে, অন্য দল আসিতেছে। শিশুদিগের ললাট পরিষ্কার, নয়ন উজ্জ্বল, মুখমণ্ডল চিন্তাশূন্য—এখনও মানব জীবনের চিন্তা সে স্বর্গীয় অবয়বে অঙ্কিত হয় নাই।

হেমলতার বিবাহের প্রায় দশ বৎসর পর হেমলতা পুত্রকন্যা-গুলিকে লইয়া একটি সন্ন্যাসীর আবাস দেখিতে গেলেন। বীরনগর